বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বাংলা মুখপত্র

বিশ্ব হিন্দু বার্তা

মূল্য : ১৫ টাকা

কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্
ॐ
ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ

৫২তম বর্ষ ◆ দ্বিতীয় সংখ্যা ◆ আশ্বিন, ১৪৩৩ [সেপ্টেম্বর, ২০২৬]

(Visualization : Prashant Singhania)

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সৎসঙ্গ বৈঠক, ভোপাল

মাতৃশক্তি প্রশিক্ষণ বর্গ, শিলিগুড়ি, উত্তরবঙ্গ

অখিল ভারতীয় প্রচার-প্রসার বৈঠক, সুরাট

রাখী বন্ধন উৎসব, লালবাগ প্রখণ্ড, মধ্যবঙ্গ

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্থাপনা দিবস উদ্‌যাপন
তমলুক, দক্ষিণবঙ্গ

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও দুর্গাপূজা কমিটির বৈঠক
EZCC, কলকাতা

কল্যাণ বাণী

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী।। ১৮/৩০।।

'হে পার্থ, যে বুদ্ধিতে বাহ্য কর্মমার্গ এবং আন্তর ধ্যানমার্গ, বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম, ভয় ও অভয়, বন্ধন ও মোক্ষ (সম্পর্কে) জানা যায়, সেই বুদ্ধি সাত্ত্বিক।"

সম্পাদকীয়...

বন্দেমাতরম গান ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত এবং সর্বপ্রথম ৭ই নভেম্বর ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গদর্শন নামক পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে 'আনন্দমঠ'-এ এর পূর্ণ প্রকাশ করেন বঙ্কিমবাবু। ধীরে ধীরে এটি মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে এই গানের অংশ গায়ন করেন শ্রীহেমচন্দ্র ব্যানার্জি। কিন্তু এই গানের আরও প্রসিদ্ধি হয়, যখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এটিকে সংগীত লয়বদ্ধ করেন, কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে নিজে গানটি গেয়ে শোনান। ১৯05 খ্রিস্টাব্দে বাংলা থেকে লাহোর পর্যন্ত সমস্ত দেশপ্রেমিকদের এই গান উৎসাহ এবং জাগরণে উদ্দিপনা তৈরি করতে শুরু করে। ইংরেজ শাসক বুঝতে শুরু করল যে, এই গান ভারতীয়দের জাগ্রত করার হাতিয়ার হতে শুরু করেছে। সবকিছুর পরেও ১৯০৬ থেকে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কংগ্রেসের প্রতিটি অধিবেশনে গানটি গর্বের সঙ্গে গাওয়া হতো। ইংরেজরা তখন এই গান মন্ত্রকে ভাঙার জন্য মুসলিম সমাজকে উত্তেজিত করতে শুরু করে। তারা মুসলিমদের বোঝাল, এই গানে মাতৃভূমি রূপে দুর্গা মাতার স্তুতি করা হয়েছে, কিন্তু তোমরা তো কেবল মাত্র আল্লাহকে মানো। তাই এর বিরোধ করা দরকার। মুসলিম তুষ্টিকরণের জন্য ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস গানের ছয়টি ছন্দ থেকে চারটি ছন্দকে বাতিল করে, কেবলমাত্র দুটি ছন্দ স্বীকার করে নেয়। কালক্রমে এই গানটি রাষ্ট্রীয় গীত বলে মান্যতা পায়। একটি বর্গ, এক ধর্মীয় মানুষদের বিরোধিতার কারণে রাষ্ট্রীয় গীত অর্ধেকই গাওয়া শুরু হয়েছিল। কংগ্রেস পার্টি দেশভক্তির এই সর্বোচ্চ গীতটিকে ছিন্নভিন্ন করেছিল। শুধু তাই নয়, ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে জরুরি অবস্থার সময়, এই গীতের ১০০ বছর পূর্তিকেও তারা সম্মান জানায়নি। কিন্তু তখন বিদ্যার্থী পরিষদ বন্দেমাতরমের শতবর্ষপূর্তি উৎসব সমিতির নামে বন্দেমাতরম রচনার শতবর্ষ পালন করেছিল। বর্তমান কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার ২০২৫-২৬ বর্ষে বন্দেমাতরম গান রচনা দেড়শ বছরে সম্পূর্ণ গানটিকে গায়ন করার জন্য আদেশ প্রদান করেছে এবং পূর্ণ রাষ্ট্রীয় গানের মর্যাদা প্রদান করেছে। এই মহতী কাজের জন্য আমরা ওদেরকে সাধুবাদ জানাই।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি প্রসন্না. বি. বরালে একটি মামলার শুনানির সময় বলেছেন, দেশের মধ্যে অনেক অপ্রয়োজনীয় খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়, এর যদি একটি ছোট্ট অংশ বুনিয়াদি শিক্ষার খাতে ব্যয় করা হত, তাহলে দেশের সরকারি বিদ্যালয়গুলোর চেহারা পাল্টে যেত। বাস্তবে এই উক্তি দেশের আর্থিক আবন্টনের উপর প্রশ্ন তুলছে তা নয়, বরং রাষ্ট্রীয় প্রাথমিকতার বিষয় নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন তুলেছে। দেশের সরকারি বিদ্যালয়গুলো বন্ধ হওয়ার আসল কারণ কেবলমাত্র ছাত্রদের অরুচি কিংবা বিদ্যালয়ে না যাওয়ার কারণে নয়, বরং প্রশাসনতন্ত্র দ্বারা অবহেলার কারণে বুনিয়াদি ব্যবস্থাকে দায়ী করা দরকার। দেশের মধ্যে আনুমানিক ১৪.৮ লক্ষ বিদ্যালয় আছে। তার মধ্যে ১০.২ লক্ষ বিদ্যালয় সরকার কিংবা সরকারি সহায়তা প্রাপ্ত স্কুল আছে। যেখানে প্রাইভেট বিদ্যালয়ে ৪.৫ লক্ষের আশেপাশে। সংখ্যার দৃষ্টিতে সরকারি স্কুলের সংখ্যা অনেক বেশি, কিন্তু গুণগত এবং সংশোধনের দৃষ্টিতে প্রাইভেট স্কুল থেকে অনেক পিছিয়ে। নিয়ম মাফিক জি.ডি.পি-র ৬% শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় করার দরকার। কিন্তু ফ্রী সুবিধা ও জিনি কারণে এটি বাস্তবে ২.৮% থেকে ৩% পর্যন্ত সীমিত আছে। এর মধ্যে মাত্র ০.৬৪ থেকে ০.৭% শিক্ষা অনুসন্ধান এবং বিকাশ খাতে ব্যয় করা হয়। এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান কেবলমাত্র আলোচনা কিংবা ভাষণবাজি করে সম্ভব হবে না। সরকারকে শিক্ষা ক্ষেত্রে খরচকে উৎপাদকহীন ব্যয় বলে না মেনে, এই ব্যয়কে রাষ্ট্রের সুরক্ষা, সমৃদ্ধি এবং সংপ্রভুতার স্তরে আবশ্যক খরচা বলে দীর্ঘকালীন নিবেশ বলে ভাবা দরকার। এছাড়া কমপক্ষে জি.ডি.পি-র ২% অর্থ বৈজ্ঞানিক এবং অনুসন্ধান খাতে ব্যয় করার দরকার। তবেই ২০৪৭ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রীর বিকশিত ভারত গঠন বাস্তব হবে বলে বিশ্বাস করি। কঠোর নীতিগত ইচ্ছা শক্তি গ্রহণ এবং সংকীর্ণ মানসিকতা ত্যাগ করেই এই লক্ষ্য অর্জন করা দরকার।

সম্প্রতি দেশের গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, অবৈধ অনুপ্রবেশকে কেবলমাত্র আইন ব্যবস্থার বিষয় ভাবা উচিত না, বরং দেশের সংপ্রভুতা, পরিচয় এবং দেশের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষার বিষয় বলে ভাবা দরকার। আসাম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, দিল্লী, মুম্বাই, বেঙ্গালুরু, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি মহানগরে বিভিন্ন অঞ্চলে অনুপ্রবেশকারীরা ঢুকে গেছে। সীমান্তবর্তী এলাকার অনেক বিধানসভার জনসংখ্যার মধ্যে এতটাই পরিবর্তন এনেছে যে মূল নিবাসীরা নিজেদের এলাকায় নিজেদেরকেই অল্প সংখ্যক অনুভব করছে। গুপ্তচর বিভাগের অনুমানে ভারতবর্ষে প্রায় ২ কোটি অনুপ্রবেশকারী দেশের মধ্যে ঢুকে গেছে। এই অনুপ্রবেশ কেবলমাত্র সীমান্তবর্তী এলাকার সমস্যা নয় বরং অনেক দূরগামী এবং ঘাতক পরিণাম দেশকে তিনটি স্তরে ক্ষতি করে চলেছে। প্রথম হচ্ছে স্থানীয় সমাজের সংস্কৃতি, ভাষা, জীবনযাপন এবং সংসাধনের উপর

চাপ সৃষ্টি করেছে, যার ফলে সামাজিক সমরসতা বিপন্ন হতে চলেছে। যখনই অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তখনই তারা তাদের আসল মূর্তি দেখানো শুরু করে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে, ভারতবর্ষের করদাতাদের প্রদত্ত অর্থে যে সমস্ত কল্যাণকারী যোজনা, কম মূল্যে আনাজ, সাবসিডি, স্বাস্থ্য সুবিধা এবং রোজগারের উপর থাবা পড়ছে ওই অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা। এর ফলে ভারতীয় নাগরিকদের প্রাপ্য সুবিধাতে ভাগ বসছে। স্থানীয় কর্মচারীদের রোজগারে অনুপ্রবেশকারীরা কম মূল্যে কাজ করে অংশীদারী হচ্ছে, ফলে দারিদ্রতা বাড়ছে। তৃতীয় হচ্ছ, দেশের মধ্যে অনেক স্থানে নকল পরিচয়পত্র যেমন—ভোটের কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, রেশন কার্ড এই সমস্ত জাল ভাবে বানানোর গ্যাং হয়েছে। ওরা অনুপ্রবেশকারীদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা নিয়ে সেইসব নকল পরিচয় পত্র বানিয়ে দিচ্ছে। যার ফলে অনুপ্রবেশকারীরা ড্রাগতস্করী, মানবতস্করী এবং দেশবিরোধী কাজে লিপ্ত হতে পারছে। বাস্তবে যারা এইসব পরিচয় পত্র বানায় তারা দেশদ্রোহী, তাদের উপযুক্ত শাস্তি হওয়া দরকার। প্রশ্ন হচ্ছ, এই সমস্ত দেশ বিরোধী কাজ অনেক দশক ধরেই চলছে, তা প্রমাণিত। কিন্তু এতদিন এই সমস্যার সমাধান কেন হয়নি? এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, ভোট ব্যাংকের রাজনীতি। বিগত ৫০ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের সরকারগুলো এই কাজে বাধা তো দেয়নি, বরং পরোক্ষভাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। বর্তমান সরকারের কাছে আমাদের আবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিতে সঠিক এবং কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে, এই সমস্ত অনুপ্রবেশকে বন্ধ করে এবং অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে, তাদের নিজেদের দেশে ফেরত পাঠান। আন্তর্জাতিক সীমানাতে কেবলমাত্র কাঁটাতারের বেড়া দিলেই চলবে না, প্রয়োজনের ড্রোন চালানো, থার্মাল সেন্সর, এ.আই আধারিত স্মার্ট ফেন্সিং অনিবার্য করা দরকার। যারা অনুপ্রবেশকারীদের সাহায্য করছে, তাদেরকেও চিহ্নিত করে, তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে, জেলে পাঠানো দরকার। অনুপ্রবেশরূপী ক্যান্সারকে সমূলে উচ্ছেদ না করলে দেশের বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বারোয়ারী পুজো কমিটির কাছে আবেদন জানানো হয়েছে, এ বছরের দুর্গাপুজো পবিত্রতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, শাস্ত্রসম্মত উপায়ে করার জন্য। দুর্গা মাতার প্রতিমাতে মাতৃত্ব ভাব যেন থাকে। মায়ের মূর্তিতে যেন কোন রকম অশোভনীয় কার্যকলাপ না করা হয়। বিগত বছরের মায়ের মূর্তিতে একজন দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তির মুখ বসানো হয়েছিল। এছাড়া বেশ কিছু মণ্ডপে জুতো, ছেঁড়া কাপড়, ভাঙা কাঁচের বোতল ইত্যাদি ব্যবহার করে পুজোর পবিত্রতাকে আঘাত করা হয়েছিল। পুজো প্যাণ্ডেলে আমিষ না খাওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অন্যসব জায়গার স্বরুচি অনুসারে খাদ্য গ্রহণ বা বিক্রয় করা যেতে আপত্তি করা হয়নি। অথচ বেশ কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ ভুয়ো খবর ছড়াচ্ছেন যে, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ থিমপূজা, আমিষ খাওয়া ইত্যাদি বন্ধ করার ফতোয়া জারি করেছে। কিন্তু বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কখনো ফতোয়া জারির মতো অগণতান্ত্রিক কাজ করে না, উপরন্ত মানুষদের সঙ্গে কথা বলেই সব সময় নির্ণয় গ্রহণ করে থাকে। আমরা সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন করছি, ভুয়ো খবরে বিশ্বাস করবেন না।

গত ১০ই মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি দেশবাসীর কাছে আবেদন করেছিলেন যে, প্রয়োজন না থাকলে সোনা ক্রয় না করা, বিদেশে ভ্রমণ না করা, যাতে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার না হয়। এই আহবানে মানুষ সাড়া দিয়েছে, তাই প্রধানমন্ত্রী পুণরায় চলতি আর্থিক বছরের প্রথম ত্রৈমাসিক ভারতের অর্থনীতি ৭.৮% হারে বৃদ্ধি পাওয়ার পর দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এক তাৎপর্যপূর্ণ ভিডিও বার্তা দিয়েছে। দেশের মূলধন যাতে দেশের অভ্যন্তরে থাকে এবং অর্থনীতির চাকা আরো দ্রুত ঘোরে, সেইদিকে লক্ষ রেখে স্বদেশী ও আত্মনির্ভরতায় নতুন করে জোর দিয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজী দেশের পর্যটন, হোটেল শিল্প ও স্থানীয় ব্যবসাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বার্তা দিয়েছেন। ভারতবাসী হিসেবে আমাদের ওঁনার আহ্বানে সাড়া দেওয়া উচিত।

গত ২৬শে আগস্ট প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নেমে আসা প্রলয়ংকরী বানে নেপাল জুড়ে নেমে এসেছে এক হাহাকারময় বিভীষিকা। পাহাড়ি ধ্বস এবং হড়পা বানের পর যত সময় গড়াচ্ছে, ততই উন্মোচিত হচ্ছে ধ্বংসের ভয়ালরূপ। এখনো পর্যন্ত প্রায় ১৫০০-র বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন এবং প্রায় ৫০০০ জন মানুষ নিখোঁজ আছেন। প্লাবনের তোরে ভেসে যাওয়া মৃতদেহগুলো সীমানা পেরিয়ে ভারতে পৌঁছতে শুরু করেছে। মানবিক সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নেপালের পাশে দাঁড়িয়েছে ভারতবর্ষ। পরিস্থিতি সামাল দিতে দিল্লি থেকে উদ্ধারকারী দল পাঠানোর পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ জরুরী ত্রাণ সামগ্রী নেপালে পাঠানো হয়েছে। বিপর্যয়ের সময় সমস্ত ভারতবাসীর নেপালের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এই কাজে আমাদের সকলেরই যথাসম্ভব সাহায্য পাঠানো দরকার। ■

আগামী দুই সংখ্যার বিষয়

কার্তিক ১৪৩৩ (অক্টোবর ২০২৬) : দুর্গাপূজা, বিজয়া দশমী, আর.এস.এস-এর প্রতিষ্ঠা দিবস, ধনতেরাস, কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, বাল্মীকি জয়ন্তী বিবিধ।

অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ (নভেম্বর ২০২৬) : দীপাবলি, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, ছট্‌পুজো, কার্তিক পুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো, গুরুনানক জয়ন্তী, রাসযাত্রা।

বিশ্ব হিন্দু বার্তা

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বাংলা মুখপত্র

কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্‌ ওঁ ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ

কার্যালয় : ৩৩, ভুপেন বোস এভিনিউ, শ্যামবাজার, কলকাতা-৭০০০০৪, দূরভাষ : ২৫৫৫-৩৫৮৯

প্রচার কার্যালয় : ১৭বি, নলিন সরকার স্ট্রিট, খান্না মোড়, কলকাতা-৪

দিলীপকুমার ঝাঁওর : ৯৯৩৩১৫০০৩৭, ড. জয়ন্ত বিশ্বাস : ৭৮৭২১৬৪৬৪৬

SCAN & PAY USING ANY BHIM UPI APP

9038149815m@pnb

MERCHANT: VISHVA HINDU VARTA

৫২তম বর্ষ ✻ দ্বিতীয় সংখ্যা ✻ আশ্বিন, ১৪৩৩ (সেপ্টেম্বর, ২০২৬)

'বিশ্ব হিন্দু বার্তা'র পরিচালন মণ্ডলী

● সভাপতি : শ্রীদিলীপ কুমার ঝাঁওর

● সহ-সভাপতি

শ্রীজয়দেব সাহা (সম্পাদক, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত)

শ্রীতরুণকুমার লায়েক (সম্পাদক, মধ্যবঙ্গ প্রান্ত)

শ্রীলক্ষ্মণ বনসল (সম্পাদক, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত)

শ্রীশঙ্কর রায় (সম্পাদক, ত্রিপুরা প্রান্ত)

● প্রসার প্রমুখ : শ্রীজয়ন্ত ভৌমিক

● সম্পাদক :

অধ্যাপক ড. জয়ন্ত বিশ্বাস

● সহ-সম্পাদক :

শ্রীসৌগত বসু, সুশ্রী পারমিতা পাল

● পৃষ্ঠপোষক :

শ্রীপ্রশান্ত সিংহানিয়া

শ্রীনিবেদন চুড়ীওয়াল

● সহ-প্রসার প্রমুখ :

শ্রীচন্দন গুপ্তা (দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত)

শ্রীবিপ্লব চ্যাটার্জি (মধ্যবঙ্গ প্রান্ত)

শ্রীশ্রীকান্ত ঘোষ (উত্তরবঙ্গ প্রান্ত)

শ্রীঅমলকান্তি দাশ (ত্রিপুরা প্রান্ত)

● সদস্য : শ্রীপীতারুণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীদীপক চৌধুরী, শ্রীঅর্ণব দে, শ্রীশুভজিৎ দাস

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ১

প্রথম পুজ্য শ্রীগণেশ—রাজকুমারী মাহেশ্বরী ৪

সামাজিক সমরসতা যোগী : অশোক সিংহলজি —দিলীপ কুমার ঝাঁওর ৫

শতবর্ষে অশোক সিংহল : সনাতন ভারত আত্মার মূর্ত প্রতীক—বিপ্লব চক্রবর্তী ৭

শাস্ত্রিক দুর্গাপূজা ফিরিয়ে আনা হোক —সুদীপনারায়ণ ঘোষ ১৩

শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি থেকে সমাজের ঐক্য—শুভাশীষ মল্লিক ১৫

গুরু প্রণাম—গোপাল চক্রবর্তী ১৬

মনসা জয়ন্তী—আলপনা ঘোষাল ১৯

ভগবান বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার : বামন অবতার —পারমিতা পাল ২২

বামন অবতার : সত্য, দান ও ধর্মরক্ষার গৌরবগাথা —মনোজ শা ২৩

রাখি বন্ধন—রবিব্রত ঘোষ ২৫

হিন্দু ধর্মে সাম্যবাদ ও শূদ্র জাগরণ—শতদ্রু পালবাগ ২৭

শুধুমাত্র হিন্দু আস্থার উপরই কেন আঘাত হানা হয়? —ড. জয়ন্ত বিশ্বাস ৩১

রাষ্ট্রবাদী রাজ্য সরকারের মাতৃভাষা-প্রেম ও কিংকর্তব্য —ড. শ্যামলচন্দ্র দাস ৩৩

শান্তি তুমি কোথায়?—সমীরণ ভৌমিক ৪২

वन्दे मातरम् : राष्ट्रचेतना का अमर स्वर —प्रशांत सिंघानिया ৪৪

गोपीप्रेम—अरुण चूड़ीवाल ৪৭

প্রতি সংখ্যার মূল্য	বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	দীর্ঘমেয়াদী গ্রাহক (১৫ বছর)	ডাক মাশুল
১৫ টাকা	১৮০ টাকা	২৫০০ টাকা	নিঃশুল্ক

বিশেষ ডাক ব্যবস্থায় 'বিশ্ব হিন্দু বার্তা'র গ্রাহক শুল্ক বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বিশ্ব হিন্দু বার্তার গ্রাহক হওয়ার জন্য নিচের দেওয়া ব্যাঙ্ক তথ্যে শুল্ক পাঠান এবং নিজের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর ও হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর এই নম্বরে জানান : জয়ন্ত ভৌমিক : ৮৯৬১৭১২১০৬

VISHVA HINDU VARTA
Punjab National Bank A/c. No. : 1183010102690
IFSC Code : PUNB0118320, MICR : 700024325
Shyambazar Market Evening Branch

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি

Back Cover Page	Rs. 50,000/-
Inside Front or Back Cover Page	Rs. 30,000/-
Inside Full Colour Page	Rs. 20,000/-
Colour Half Page	Rs. 10,000/-
Colour Quater Page	Rs. 5,000/-

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন

E-mail : advertisement.vishvahinduvarta@gmail.com

চিঠিপত্র বিভাগ

পত্রিকার লেখা সংক্রান্ত কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে এই নম্বরে হোয়াট্‌অ্যাপ করুন ৭৮৭২৪৬১৬১৬

প্রকাশন বিভাগ : বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, দক্ষিণবঙ্গ

মুদ্রণ : আদিত্য গ্রাফিক্স অ্যান্ড প্রিন্টিং

RNI No. : 30136/1976

● লেখকদের প্রতি

১। প্রতি ইংরেজি মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে লেখা পাঠান।

২। পরিষদ সম্পর্কে বার্তা ছবি ও প্রতিবেদন e-mail কিংবা WhatsApp-এর মাধ্যমে পাঠাতে পারেন।

৩। প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখিত তথ্যের দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে লেখক বা প্রাবন্ধিকের, কর্তৃপক্ষের নয়।

প্রথম পুজ্য শ্রীগণেশ

রাজকুমারী মাহেশ্বরী

সনাতনী পরম্পরাতে যে কোন শুভকাজ, পূজা-অর্চনা করার সময় সবার আগে ভগবান গণেশের পুজো করার বিধান আছে। পৌরাণিক কথা অনুসারে একবার সব দেবতারা ভগবান শিবের কাছে গিয়ে, প্রশ্ন তোলেন যে তাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? কার পূজা সবার আগে করা হবে? ভগবান শিব অনুভব করলেন, যে দেবতাদের মনে অহংকার জন্ম নিয়েছে। সেই অহংকারকে নষ্ট করার জন্য মহাদেব ওঁনাদের বললেন, যে দেবতা সবার আগে সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডকে পরিক্রমা করে আসবেন তাঁরই পূজা সবার আগে হবে। প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য, সব দেবতারাই নিজ নিজ বাহন নিয়ে পরিক্রমার জন্য বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু গণেশ ওইভাবে প্রতিযোগিতায় না গিয়ে, ভগবান শিব এবং মাতা পার্বতীকে ঘিরে সাতবার পরিক্রমা করে, ওঁনাদের সামনে হাত জোড় করে বসে পড়েন। এরপর একে একে সব দেবতারা ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমা করে ফিরে এলে, ভগবান ভোলেনাথ, শ্রীগণেশকে বিজয়ী ঘোষিত করে, প্রথম পুজোর অধিকারী বলে মান্যতা প্রদান করলেন। তখন সমস্ত দেবতাই প্রশ্ন তুললেন যে, 'গণেশ তো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেননি, তাহলে কেন তাকে বিজয়ী ঘোষণা করা হল?' উত্তরে ভোলানাথ বললেন, 'শাস্ত্রে প্রমাণিত আছে যে, সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড মাতা-পিতার চরণেই আছে এবং ব্রহ্মাণ্ডে মাতা-পিতার স্থান সবার উপরে। তাই শ্রীগণেশের ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমার সবার আগেই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। দেবতারাও এই যুক্তি স্বীকার করে নিলেন। তারপর থেকেই শ্রীগণেশ সবার আগে পুজো পাওয়ার অধিকার লাভ করলেন।

শ্রীগণেশের বুদ্ধিমত্তার কারণেই ওঁনাকে মহাভারত কথা শুনবার সঙ্গে সঙ্গে লেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। শ্রীগণেশ তাঁর ভাই কার্তিকের সঙ্গে অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং দেবান্তক, সিন্ধু দৈত্য, সিন্ধুরাসুর, মতস্যাসুর, ক্রোধাসুর, মদাসুর, মোহসুর, কামাসুর, লোভাসুর, মমাসুর, অহন্তাসুর প্রভৃতি অসুরদের বধ করেন। শ্রীগণেশ আধারিত অনেক গ্রন্থ পাওয়া যায়। যেমন—গণেশ পুরাণ, গণেশ চালিশা, গণেশ স্তুতি, গণেশ কবচ, গণেশ সহস্র নামাবলী, সংকটনাশক গণেশ স্তোত্র, শ্রীগণেশ আরতি, গণপতি অর্থর্ব্য শীর্ষ, সন্তান গণপতি স্তোত্র, ঋণ হর্তা গণপতি স্তোত্র, ময়ূরেশ্বর স্তোত্র ইত্যাদি।

ভগবান গণেশের সত্যযুগে বাহন ছিল সিংহ এবং উঁনি দশভূজাধারী। উনার নাম ছিল বিনায়ক। ক্রেতাযুগে শ্রীগণেশের বাহন ছিল ময়ূর, তাই ওঁনাকে ময়ূরেশ্বর বলা হত এবং উনি ছয় ভূজাধারী এবং শ্বেত রংধারী ছিলেন। দ্বাপর যুগে ওঁনার বাহন ছিল মুষক, তিনি চার ভূজাধারী এবং লাল রংধারী। এই যুগে ওঁনাক গজানন বলা হয়ে থাকে। কলিযুগে ওঁনার বাহন হচ্ছে ঘোড়া এবং উনি ধুম্রবর্ণধারী। এই যুগে উনি দুই ভূজাযুক্ত এবং ওঁনার নাম হচ্ছে ধুম্রকেতু। শ্রীগণেশ জলতত্ত্বের অধিপতি, বুধবার এবং চতুর্থীর স্বামী। কেতু ও বুধ গ্রহপতি শ্রীগণেশকে একদন্ত, চতুর্বাহু, লম্বোদর প্রভৃতি নামের স্মরণ করা হয়। শ্রীগনেশকে আদিদেবও বলা হয়, যিনি সব যুগেই পৃথক পৃথক অবতার গ্রহণ করেন। শিবমানস পূজাতে শ্রীগণেশকে প্রণব বলা হয়েছে। এই এক অক্ষর ব্রহ্মতে উপরের অংশ গণেশের মস্তক, নীচের অংশ উদর, চন্দ্র বিন্দু লাড্ডু এবং মাত্রা শুড়। চার দিশসস্থলীতে সর্ব ব্যাপকতার প্রতিক ওঁনার ভূজাকে দর্শায়। বড় কান, অধিক গ্রাহ্ম শক্তির প্রতীক এবং ছোট কিন্তু তীক্ষ্ণ চোখ সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সূচক। ওঁনার লম্বা নাক (শুঁড়) মহা বুদ্ধিতার প্রতীক বলেই ভাবা হয়। গণেশের পেট উদারতার প্রতীক এবং সম্পূর্ণ স্বীকারতাকেই দর্শায়। গণেশের উপরে ওঠা হাত রক্ষার প্রতীক। শ্রীগণেশ একদন্ত, যার অর্থ হচ্ছে একাগ্রতা। ওঁনার এক হাতে অঙ্কুশের অর্থ হচ্ছে, জাগৃত থাকা। অন্য হাতে পাঁসের অর্থ হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ রাখা। বাস্তবে জাগৃতির সঙ্গে অনেক তেজ এবং উর্জ্জার উৎপত্তি হয়ে থাকে, যাকে নিয়ন্ত্রণে না রাখলে অনর্থ হতে পারে। শ্রীগণেশের বাহন মুষক বা ইঁদুর যার অর্থ হচ্ছে, যে কোন বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রতীক। আমাদের হৃদয়ের যে অজ্ঞানরূপী বাঁধন আছে তার থেকে মুক্ত হওয়ার নির্দেশ দর্শায়। আমাদের ধর্মগ্রন্থ, ঋষি মুনিরা এতটাই বুদ্ধিমান ছিলেন যে, তারা আমাদের দিব্যতাকে শব্দের মাধ্যমে না বুঝিয়ে প্রতীকের মাধ্যমে বুঝিয়েছেন। কারণ শব্দ তো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলাতে থাকে, কিন্তু প্রতীক চিহ্ন কখনো বদলায় না। তাই আমাদের ধ্যানের মধ্যে প্রতীক চিহ্ন দেবতাদের স্মরণ করা খুবই সহজ হয়ে যায়। বাস্তবে মনে রাখা দরকার, ভগবান সর্বদাই আমাদের হৃদয় ও মনে বিরাজ করেন, তাই হৃদয়ে দেবতাকে স্মরণ করা বুদ্ধিমানের কর্তব্য।

ভারতবর্ষে বালগঙ্গাধর তিলক এই গণেশ পূজাকে সর্বজনীন পূজা রূপে পালন করা শুরু করেছিলেন। এই উৎসবের মাধ্যমে সমাজের মানুষকে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে একত্রীকরণের কাজ করেছিলেন তিনি। কালক্রমে প্রথম দিকে গণেশের উৎসব ১০ দিন ধরে মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকে পালন করা হতো। কিন্তু ধীরে ধীরে গণেশ উৎসব বর্তমানে সম্পূর্ণ ভারতবর্ষে পালিত হচ্ছে। নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান বিবিধের মাঝে এইটি সমাজের মহান মিলনের উৎসবে পরিণত হয়েছে। ■

সামাজিক সমরসতা যোগী : অশোক সিংহলজি

দিলীপ কুমার ঝাঁওর

উত্তরপ্রদেশের এক প্রতিষ্ঠিত ধনী পরিবারে অশোক সিংহলজির জন্ম হয়েছিল। ওঁনার পিতা উত্তর প্রদেশের প্রশাসনিক সেবাতে উচ্চ পদে আসীন ছিলেন। ওঁনার বড় ভাইও উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন এবং ব্যবসা করতেন। অশোকজি স্বয়ং বেনারস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাইনিং মেটোলজি বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত করেছিলেন। পরিবারের জন্য অন্য সদস্যদের মতনই তিনি ব্যবহারিক জীবনে সফল হতে পারতেন, কিন্তু তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রচারক জীবনকে বেছে নিয়েছিলেন। সংঘ মানুষ তৈরির কাজ করে, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছেন, শ্রীঅশোক সিংহলজি। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে ওঁনাকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কাজের জন্য সংঘ নির্দেশ দেয়। সর্বপ্রথম উঁনি পরিষদের সংযুক্ত মহামন্ত্রীর দায়িত্বে নিযুক্ত হন। পরবর্তী সময়ে কার্যকরী সভাপতি এবং আরও পরে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন তিনি। অশোক সিংহলজির আগ্রহে পরিষদে সামাজিক সমরসতার কাজ শুরু হয়।

মাননীয় অশোক সিংহলজি বলতেন, 'অস্পৃশ্যতা মানসিক সামাজিক বিকৃতি, যা কেবলমাত্র আইনের সাহায্যে সমাপ্ত করা সম্ভব নয়, কিংবা রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করে মেটানো যাবে না। অস্পৃশ্যতার প্রদূষণকে মেটানোর জন্য, সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজকে হিন্দু ধর্মের মানবতাবাদী, সমতাবাদী, একাত্মতাবাদী 'অহং ব্রহ্মাস্মি, আত্মবতঃ সর্বভুতেশু', এই তত্ত্বদর্শনকে সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে ব্যবহারিক জীবনের ধারাতলে আনতে হবে।' এই কারণে বিশ্ব হিন্দু পরিষদে সমরসতার কাজ শুরু হয়। শুরুতেই শ্রীরামফলজি এবং দেউজী ভাই রাওতকে এর দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রান্ত, জেলা, গ্রাম, প্রখণ্ড স্তরে এই কাজের বিস্তারের ফলে আজ দেশ জুড়ে সামাজিক সমরসতার জাগরণ নির্মাণ হয়েছে।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার প্রফেসর কে. আর মলকানির নেতৃত্বে একটি অনুসন্ধান সমিতির নির্মাণ হয়েছিল, যে সমস্ত জাতির মানুষ সাফাই কাজের সঙ্গে যুক্ত তাদের বাসস্থান, শিক্ষা ব্যবস্থা, আর্থিক স্থিতির অধ্যায়ন করার জন্য। প্রায় ১০ বছর অধ্যায়ন করার পর সার্ভে রিপোর্টে বলা হয়, এই সমস্ত জাতির মানুষদের পূর্বপুরুষ রাজাদের সেনাবাহিনীতে সৈনিক ছিলেন। মুঘলদের হাতে রাজারা পরাজিত হওয়ার পর ওদেরকে সাফাই কর্মচারী হিসেবে কাজ করানো শুরু হয়। কিছু সৈনিকদের মাংস কাটার কাজে নিযুক্ত করা হয়। কালক্রমে এই ক্ষত্রিয়রা চামার, বাল্মীকি, মহার প্রভৃতি জাতির নামে পরিচিত হয়। তাদেরই বর্তমান সময় দলিত বলা হয়। এদের গোত্রে এই কারণেই ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মিল দেখা যায়। বাস্তবে হিন্দু সমাজের ধর্মশাস্ত্রে অস্পৃশ্যতা, উচ্চ-নীচ, ছুৎ-অছুতের কোন স্থান ছিল না। ইতিহাসের বিদ্বানরা দিল্লিতে, এক বৈঠকে সৌদ্ধপত্র প্রমাণ সহ এই বিষয়টি রেখেছিলেন।

ওই সময় মীনাক্ষীপুরমে ৩০০ পরিবারকে মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল। বাবাসাহেব আম্বেদকর লিখেছিলেন, 'বেদের মধ্যে অস্পৃশ্যতার মতন কোন শব্দ নেই। স্মৃতির কালে অপবিত্রতা ছিল, কিন্তু অস্পৃশ্যতা ছিল না।' ৬০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চণ্ডাল রাজবংশের রাজত্ব ছিল। মহারদের গোত্র এবং মারাঠীদের গোত্রের সমানতা আছে। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে কর্নাটকের উড়পি ধর্মস্থলে সম্মেলন করা হয়, যেখানে ১৭৪টি হিন্দু মঠাধিপতিরা সর্বসম্মতিতে অস্পৃশ্যতা উনমুলন এবং হিন্দু একতার জন্য আহ্বান জানায়। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দেই অশোকজির প্রয়াসে কেরালা থেকে সন্ত যাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। দুইটি মুখ্য যাত্রা শুরু করা হয়েছিল, প্রথমটি দক্ষিণ দিক থেকে এবং দ্বিতীয়টি উত্তর দিক থেকে। কন্যাকুমারী এবং মুকাম্ঠিকা মন্দির থেকে দিব্যজ্যোতি প্রাপ্ত করে দুইটি রথযাত্রা রাখা হয়। ২৫ দিন ধরে, ১৪টি জেলাতে এই রথযাত্রার মাধ্যমে অনুসূচিত জাতি, বঞ্চিতদের বস্তিগুলিতে জনজাগরণের কাজ করা হয়েছিল। যাত্রার সময় সাধু সন্তরা সেবা বস্তিতে সবার সঙ্গে ভোজন করে সামাজিক সমরসতার বাতাবরণ নির্মাণ করেছিলেন।

শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির নির্মাণ আন্দোলনের সময় শ্রীরাম-জানকী রথযাত্রা এবং ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে গ্রাম গ্রাম থেকে শ্রীরাম শিলা পূজন করে লক্ষ লক্ষ শিলা (ইট) অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের জন্য সংগ্রহ করা হয়। ৯

নভেম্বর ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ লক্ষ রাম ভক্তদের উপস্থিতিতে কয়েক হাজার সাধু সন্তদের উপস্থিতিতে রাম মন্দির নির্মাণের জন্য প্রথম শিলা পূজা কামেশ্বর চৌপাল নামক এক অনুসূচিত জাতির ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল অশোকজি নেতৃত্বে। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে ১৭ই মার্চ কাশীর ডোম রাজার নিমন্ত্রণে শ্রীঅশোক সিংহলজির নেতৃত্বে পূজ্য অবৈধনাথজি মহারাজ এবং কয়েক শত সাধু সন্তরা ওঁনার বস্তিতে ভোজন গ্রহণ করে, সামাজিক সমরসতাকে স্থাপিত করেছিলেন। নাগপুরের দীক্ষাভূমিতে ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকরের প্রতিমাকে পুষ্প মালা চড়িয়ে, শ্রদ্ধা সুমন অর্পণ করা করে সমরসতার সন্দেশ প্রদান করেছিলেন— করবীর পিঠের জগৎগুরু শঙ্করাচার্য শ্রীবাসুদেবানন্দ সরস্বতী মহারাজ, পেজাওয়ার মঠের মধ্যাচার্য জগদগুরু বিশ্বেশতীর্থ মহারাজ, পূজ্য মহন্ত নিত্যগোপাল মহারাজ, পূজ্য রামভদ্রাচার্য মহারাজ প্রভৃতি সাধু-সন্ত ও সন্ন্যাসীরা। এই মহতি কাজের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অশোক সিংহলজি।

১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে অশোকজির উপস্থিতিতে উত্তরপ্রদেশের মোদিপুরমে তৃতীয় বৌদ্ধ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে ১০০-র বেশি সাধু-সন্তরা অংশগ্রহণ করেছিল। এই সম্মেলনে স্থির করা হয়, বৌদ্ধ এবং হিন্দুদের মধ্যে সদ ভাবনা এবং সমরসতা নির্মাণ করা আবশ্যক। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ৭ নভেম্বর অশোকজির প্রেরণাতে পোপ জনপোল দ্বিতীয়-এর বিরুদ্ধে জনমত নির্মাণ করা হয়। কারণ খ্রিস্টান মিশনারীরা গরীব দলিত হিন্দুদের ছলনা করে ধর্ম পরিবর্তন করানোর কাজকে উৎসাহিত দিতেই পোপ ভারতবর্ষে এসেছিলেন। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে বনবাসী ক্ষেত্রে একল বিদ্যালয়ের স্থাপনা করে অনুসূচিত জনজাতির মধ্যে খ্রিস্টান ধর্মান্তরণের বিষয়ে জাগরণ আনার জন্য অভিযান শুরু করেন অশোকজি। বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ একল বিদ্যালয় চলেছে ভারতবর্ষে। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে অশোকজির প্রেরণাতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সন্ত রবিদাস চেতনা যাত্রার আয়োজন করে। সন্ত রবিদাস এক মহান সন্ত ছিলেন, যাঁর শিষ্যা ছিলেন, মীরাবাঈ। মহারানা সাঙ্গার মহারানী ঝালাবাই-জীও রবিদাসজির শিষ্যা ছিলেন। যদিও সন্ত রবি দাসজির জন্ম কাশীতে হয়েছিল, কিন্তু ওঁনার সমাধি চিতোরগড়ে আছে। তাই চিতোরগড় থেকে কাশি পর্যন্ত ১৫ দিন ব্যাপী চেতনা যাত্রা করা হয়। সামাজিক সমরসতার নিরিখে এই চেতনাযাত্রা খুব প্রভাব বিস্তার করেছিল, ছুঁত-অছুঁতের মতন কুপ্রথাকে সমাপ্ত করার দিশাতে।

মাননীয় অশোকজির সম্পূর্ণ চিন্তন হিন্দু সমাজের একতা, সমরসতা নির্মাণ করার জন্য সমর্পিত ছিল। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সংগঠনের মাধ্যমে সমাজে জাগরণ এবং বৈচারিক প্রবোধনের সঙ্গে অনুসূচিত জাতি জনজাতির সমস্ত সমাজের মধ্যে অনেক ধরনের উপক্রম আরম্ভ করে সমরসতা নির্মাণের কাজকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। বাস্তবে সব কাজের সফলতা অর্জন, ইচ্ছা শক্তির মধ্যে নিহিত আছে। অদম্য সাহস, দৃঢ় বিশ্বাস এবং ইচ্ছা শক্তি আধ্যাত্মিক তপস্যা ও সাধনা দ্বারা প্রাপ্ত হয়। মাননীয় অশোকজিকে আমি নিজে দেখেছি, যখন উঁনি আমার কাশিমবাজার স্থিত গৃহে আসেন। ওঁনার মধ্যে আমি সেই আধ্যাত্মিক দিব্য শক্তিকে অনুভব করেছি। অশোক সিংহলজি একজন দেশভক্ত, ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যে কাজের জন্য একবার সংকল্প নিতেন, সেই কাজ পূর্ন না করে বিশ্রাম নিতেন না। অশোকজি যেমন একদিকে শ্রীরাম জন্মভূমি মুক্তি আন্দোলনের সুত্রধার ছিলেন, তেমনি হিন্দু সমাজের একতার জাগরণ এবং সামাজিক সমরসতার অনেক আন্দোলনের সুত্রধারও তিনি ছিলেন। সেই জন্য অশোকজিকে সামাজিক সমরসতার যোগী বলা উচিত। ■

পরিষদ বার্তা

ওড়িশার কটক শহরে ক্ষেত্র সংস্কার শালার বৈঠক

গত ২২-২৩ আগস্ট ওড়িশার কটক শহরে যশোদা ভবনে ২ দিন ব্যাপী সংযুক্ত ক্ষেত্র সংস্কার শালার বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এই বৈঠকে দক্ষিণবঙ্গ, মধ্যবঙ্গ, পূর্ব ওড়িশা, পশ্চিম ওড়িশা, ঝাড়খন্ড থেকে প্রায় ২০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিলেন। উত্তরবঙ্গপ্রান্ত এবং গৌহাটি ক্ষেত্রের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় সেবা প্রমুখ শ্রীঅজয় পারেখ, সহসেবা প্রমুখ শ্রীস্বপন মুখার্জী, ক্ষেত্র সেবা প্রমুখ শ্রীসুধাংশু পাত্র, সহ সেবা প্রমুখ শ্রীহরিশ প্রধান। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, শ্রীশরৎ প্রধান, শ্রীশরৎ সাহু প্রভৃতি গণ্যমান্য কার্যকর্তাবৃন্দ। সমগ্র বৈঠকের ব্যবস্থা দেখেন শ্রীবংশীধর প্রধান এবং মনোজ গুন্টেজি। এই বৈঠকে খড়গপুর, কৃষ্ণনগর, রাউরকেল্লা, ভুবনেশ্বর, বড়গর প্রভৃতি শহরে নতুন সংস্কার শালা চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

শতবর্ষে অশোক সিংহল : সনাতন ভারত আত্মার মূর্ত প্রতীক

বিপ্লব চক্রবর্তী

১৯২৬ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর। উত্তরপ্রদেশের হরদোই জেলা। এক সরকারি অফিসারের ঘরে জন্ম নেওয়া শিশুটির কপালে কেউ সেদিন লিখে দেয়নি যে ১০০ বছর পর ২০২৬ সালে এসে তাঁর জন্মশতবর্ষে গোটা দেশ 'ভারত মাতা কি জয়' ধ্বনিতে মুখর হবে। সেই শিশুর নাম অশোক সিংহল। জীবনে কোনোদিন মন্ত্রী হননি, সাংসদ হননি, কোনো সরকারি চেয়ারে বসেননি। তবুও ভারতবর্ষ তাঁকে মনে রেখেছে 'ভারত মাতার এক নিবেদিত প্রাণ সন্তান' হিসেবে। কারণ তিনি ক্ষমতা চাননি, তিনি চেয়েছিলেন পরিবর্তন।

ছোটবেলা কেটেছে দেশের নানা প্রান্তে। বাবা সরকারি চাকরি করতেন বলে সুযোগ হয়েছিল ভারতকে কাছ থেকে দেখার। পড়াশোনায় ছিলেন অসাধারণ মেধাবী। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে স্নাতক হওয়ার পর IIT রুরকি থেকে মেটালার্জিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করলেন। সামনে খোলা ছিল সরকারি চাকরির দরজা, এমনকি বিদেশে গিয়ে স্থায়ী হওয়ার সুযোগও। কিন্তু ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ১৬ বছরের কিশোর অশোকের জীবনের সব হিসেব পাল্টে দিল। সেদিনই তিনি প্রথম RSS-এর শাখায় পা রাখলেন। তারপর ১৯৬৫ সালে সব মায়া কাটিয়ে ঝোলা কাঁধে বেরিয়ে পড়লেন। ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি, বিদেশের স্বপ্ন, সব ছেড়ে হয়ে উঠলেন RSS-এর পূর্ণকালীন প্রচারক। পরে হাসতে হাসতে বলতেন, ''আমি লোহা গলানোর ইঞ্জিনিয়ার ছিলাম। এখন মানুষ আর সমাজ গড়ার ইঞ্জিনিয়ার হয়েছি।''

অশোক সিংহলের কাছে ভারত শুধুমাত্র একটি মানচিত্রের নাম ছিল না। তাঁর কাছে ভারত ছিল একটা সভ্যতা, একটা চিন্তা, একটা জীবনবোধ। তিনি বিশ্বাস করতেন কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সব মানুষ একই সাংস্কৃতিক সূত্রে বাঁধা। এই সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের কথাই তিনি সারাজীবন বলে গেছেন। আর এই ভাবনার সবচেয়ে বড় প্রকাশ ঘটেছিল রাম জন্মভূমি আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। ১৯৮৪ সালে যখন তিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক কার্যকারী সভাপতির দায়িত্ব নিলেন, তখন অযোধ্যার রাম জন্মভূমির বিষয়টি শুধু আদালতের ফাইলে ধুলো খাচ্ছিল। অশোক সিংহল সেই ফাইল টেনে এনে রাখলেন জনতার মাঝে। তিনি বুঝেছিলেন এটা শুধু একটা মন্দিরের প্রশ্ন নয়, এটা একটা জাতির আত্মসম্মানের প্রশ্ন। তাঁর ভাষায়, যে জাতি নিজের আরাধ্য দেবতার জন্মস্থানকেই রক্ষা করতে পারে না, সেই জাতি দীর্ঘদিন মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারে না।

এই ভাবনা থেকেই শুরু হল ঐতিহাসিক রামশিলা পূজন। দেশের গ্রামে গ্রামে ঘুরে পাথর সংগ্রহ করা হল, পুজো করে সেই শিলা অযোধ্যায় নিয়ে যাওয়া হল। এরপর এল রাম রথযাত্রা। লালকৃষ্ণ আদবানির নেতৃত্বে শুরু হওয়া সেই যাত্রা গোটা দেশকে এক সুতোয় বেঁধে দিল। আর পর্দার আড়ালে এই সবকিছুর মূল কৌশলী ছিলেন অশোক সিংহল। তিনি সাধু-সন্ত, সমাজকর্মী, যুবক সবার মধ্যে সমন্বয় করলেন। কারসেবা হল, সংকল্প দিবস হল, লক্ষ মানুষের সমাবেশ হল। বহু বাধা এসেছে, বহু সমালোচনা হয়েছে, এমনকি কারাবরণও করতে হয়েছে। কিন্তু তিনি থেমে থাকেননি। বারবার বলতেন, এই আন্দোলন ঘৃণার বিরুদ্ধে নয়, এটা আত্মবিস্মৃতি থেকে জেগে ওঠার আন্দোলন।

এই আন্দোলনের সময়ই তৈরি হয়েছিল তিন মূর্তির এক অদ্ভুত সম্পর্ক। একদিকে অটল বিহারী বাজপেয়ী, যাঁকে অশোক সিংহল বলতেন 'আমাদের কণ্ঠ'। অটলজির কবিতা আর আদর্শ রাজনীতির মুখ দিয়েছিল আন্দোলনকে। অন্যদিকে লালকৃষ্ণ আদবানি, যিনি রথে চেপে দেশ জাগিয়েছিলেন আর অশোক সিংহল সেই জাগরণকে সংগঠনে বেঁধেছিলেন। পরে আদবানিজি নিজেই বলেছিলেন, অশোক সিংহল ছাড়া এই আন্দোলন ভাবাই যায় না। আর তৃতীয়জন নরেন্দ্র মোদী। তখন গুজরাটের এক RSS প্রচারক। অশোক সিংহল তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। ২০১৪ সালে যখন মোদীর নেতৃত্বে NDA সরকার ক্ষমতায় এল, অনেকে বলেছিলেন নতুন রাম রাজ্যের শুরু। অশোক সিংহলও খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি জানতেন সরকার আসা মানেই কাজ শেষ নয়। ক্ষমতায় আসার এক বছর পরেই ২০১৫ সালের ১৭

নভেম্বর দিল্লির এক হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর সবচেয়ে বড় আক্ষেপ ছিল এটাই, তিনি ২০২০ সালের ভূমিপূজন বা ২০২৪ সালের প্রাণপ্রতিষ্ঠা দেখে যেতে পারলেন না। কিন্তু যে পথ তিনি দেখিয়ে গিয়েছিলেন, সেই পথেই দেশ এগিয়েছে।

অশোক সিংহল শুধু আন্দোলনের মানুষ ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন সেবাই আসল ধর্ম। তাই তাঁর হাত ধরেই বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মধ্যে একে একে গড়ে উঠল ধর্ম প্রসার, সেবা, সংস্কৃতি, গো-সেবা আর বিদেশ বিভাগ। তিনি বলতেন, যে হিন্দুকে বাঁচাতে পারবে না সে হিন্দুত্বের কথা বলবে কী করে। তাই আদিবাসী এলাকায় একলব্য স্কুল খুলেছেন, হাসপাতাল গড়েছেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। আর উত্তর-পূর্ব ভারতকে তিনি বলতেন ভারতের সাংস্কৃতিক সীমান্ত। তাই বারবার ছুটে গেছেন ত্রিপুরা, আসাম, মণিপুর, অরুণাচলে। ত্রিপুরার আদিবাসী এলাকায় বসে বলেছেন, এখানকার ত্রিপুরী, জমাতিয়া, চাকমা সবার রক্তে একই ভারতীয় সংস্কার বইছে। অসমে ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে দাঁড়িয়ে VHP-র শাখা শক্ত করেছেন। মণিপুর আর অরুণাচলে গিয়ে যুবকদের বলেছেন, এখানে ভাষণ নয়, কাজ দেখাতে হবে। তাঁর জন্যই আজ উত্তর-পূর্বে VHP-র সেবা প্রকল্প আর সংস্কার কেন্দ্রগুলো দাঁড়িয়ে আছে।

ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর সম্বল বলতে ছিল একটা ঝোলা আর কয়েকটা কুর্তা। বিয়ে করেননি। নিজের কোন বাড়ি ছিল না। বারবার মন্ত্রীত্বের প্রস্তাব এসেছে, হাসিমুখে ফিরিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, আমি ক্ষমতা চাই না। ৮০ বছর বয়সেও ট্রেনের স্লিপার ক্লাসে চেপে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মাধ্যমে ১৫০টির বেশি দেশে ছড়িয়ে থাকা ভারতীয়দের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ তৈরি করেছেন। আজকের যুবসমাজকে শিখিয়েছেন লজ্জা পেয়ে নয়, গর্বের সঙ্গে বল আমি ভারতীয়, আমার একটা গৌরবময় ঐতিহ্য আছে।

আজ যখন ভারত বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর স্বপ্ন দেখছে, তখন অশোক সিংহলের জীবন আমাদের তিনটি বড় শিক্ষা দেয়। প্রথমত, মূল ছাড়া উন্নতি অর্থহীন। টেকনোলজি আমাদের চাই, কিন্তু শিকড় ভুলে গেলে চলবে না। দ্বিতীয়ত, দেশ বদলাতে ভাষণ নয়, মাটিতে নেমে কাজ করা কর্মী দরকার। আর তৃতীয়ত, বিভেদ ভুলে আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা সবাই এক। অনেকে তাঁকে কট্টর বলেছে, সমালোচনা করেছে। কিন্তু তিনি রাগ দিয়ে নয়, কাজ দিয়ে তার উত্তর দিয়েছেন।

ইতিহাস শুধু সিংহাসনে বসা মানুষেরা লেখেন না। ইতিহাস লেখে সেই এক সন্তান, যে নিঃশব্দে, নিঃস্বার্থে মায়ের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেয়। ২০২৬ সালে তাঁর জন্মশতবর্ষে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর সবচেয়ে বড় উপায় হল তাঁর পথে হাঁটা। সনাতন ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরা, ত্যাগের মানসিকতা রাখা, আর জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী এই মন্ত্রে জীবন কাটানো। নমস্তে সদা বৎসলে মাতৃভূমে। ■

পরিষদ বার্তা

রাখী বন্ধন উৎসব

★ ব্রহ্মপুর জেলার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে পারস্পরিক স্নেহ, একাত্মতা সমরসতা ও দৃঢ় সংকল্পের উৎসব শুভ 'রাখী বন্ধন' উপলক্ষে লালবাগ বি এস এফ ক্যাম্প ও বহরমপুর পুলিশ স্টেশনে যাওয়া হয়। সেখানে সাধারণ সুরক্ষা কর্মী থেকে শুরু করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত প্রত্যেকের হাতে রাখী বেঁধে দেওয়া হয়। বিষয়টা উনারা খুব আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেন ও খুশি মনে বোনেদের মিষ্টি মুখ করান। উভয় স্থানেই উপস্থিত ছিলেন, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মধ্য বঙ্গ প্রান্তের সহ-সভাপতি শ্রীমতি সুনন্দা ঠাকুর। ব্রহ্মপুর জেলার সংগঠন সম্পাদক রণজিৎ প্রামাণিক এবং মাতৃশক্তি ও দুর্গা বাহিনীর দিদি-বোনেরা।

★ গত ২৮ আগস্ট, শুক্রবার, পবিত্র রাখি পূর্ণিমার দিন, সন্ধ্যে ছটায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ উত্তর কলকাতা জেলার অন্তর্গত বরানগর পশ্চিম প্রখণ্ডে ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের যোগেন্দ্র বসাক রোড হরিজন বসতির সামনে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্থাপনা দিবস কার্যক্রম উপলক্ষে পথসভার আয়োজন করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বরানগর পশ্চিম প্রখণ্ডের কার্যকর্তাবৃন্দ। উক্ত পথসভায় বক্তব্য রেখেছেন উত্তর বিভাগ সম্পাদক শ্রীযুক্ত অরিন্দম কর মহাশয়, উত্তর কলকাতা জেলা সম্পাদক শ্রীঅভিজিৎ চৌধুরী মহাশয়, জেলা সহ-সভাপতি মহাদেব পণ্ডিত মহাশয় এবং জেলা সহ সম্পাদক শ্রীকার্তিক শাসমল মহাশয়।

বন্দে মাতরম্

বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলা মাতরম্।
শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিতযামিনীং
ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীং
সহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরম্।।
কোটি কোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদ করালে
কোটি কোটি ভুজৈর্ধৃত খরকরবালে
অবলা কেন মা এত বলে।
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং রিপুদলবারিণীং মাতরম।
তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম, তুমি হৃদি তুমি মর্ম,
ত্বং হি প্রাণাং শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল দল বিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং সুজলাং সুফলাং মাতরম্
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং ধরণীং ভরণীং মাতরম্।
বন্দে মাতরম্।।

মাতৃভূমির চরণে প্রণাম

Shyamji Jaiswal

KOLKATA - 700004

শান্তি মন্ত্র

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব।।
ওঁ অসতো মা সদ্গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।
সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ ভবেৎ।।

With Best Compliments From :

BISWARUP ENTERPRISE

154, A. J. C. Bose Road, Kolkata-700006

With Best Compliments From :

Krishna
Event & Hospitality

6291 699 172 / 9123 905 548
somenathd247@gmail.com
127/9 Maniktala Main Road,
Kolkata - 700 054

KE Hospitalyty

Follow us on : f / Krishna Events
Follow us on : Ke_hospitality0.3

With best compliments from :

BSL Ltd. is one of India's leading and
oldest textile mills based in
Bhilwara, Rajasthan.

We manufacture PV & PW Suiting's alongwith
a varied range of furnishing fabrics
and a complete array of
Synthetic, Worsted, Vortex and Cotton yarns.

Our products are exported to over
55 countries in the world.

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত রাষ্ট্রবাদী নাগরিকদের প্রতি গৈরিক শুভেচ্ছা :

POULGEN RESEARCH & BREEDING FARMS

Breed Name : JANGALMAHAL DESI (CHICKEN)

(DESI MURGI)

Proprietor : SOURAV KUMAR PATRA

Breed Develop by : Dr. Biplab Kumar Patra, M.Vse (Poultry)

আত্মনির্ভর ভারত গড়ার লক্ষ্যে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। স্বনির্ভর যোজনায় আগামীর সফল উদ্যোগপতি গড়ার লক্ষ্যে উৎসাহী ব্যক্তি কার্যকর্তা কর্মীদের নিঃশুল্ক সহায়তা (প্রশিক্ষণ, ব্যাঙ্কিং) ব্যবস্থা প্রদান করে থাকি।

যোগাযোগ

POULGEN RESEARCH & BREEDING FARMS

Vill-Bhetia, P.O.-Salua, P.S.-Kharagpur Local
Dist-Paschim Medinipur, West Bengal-721145

Mobile : +91 9547907336, 7001944198

E-mail : drbkpatra@gmail.com, souravdvet2012@gmail.com

শাস্ত্রিক দুর্গাপূজা ফিরিয়ে আনা হোক

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

সাম্প্রতিক কুড়ি পঁচিশ বছর যাবৎ একটা বাগবন্ধ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে হিন্দু বাঙালির রসনায়; থিমপুজো। প্রথম আপত্তি থিম শব্দটাই তো বিদেশি আর পুজো সম্পূর্ণ স্বদেশি। এইরকম বকচ্ছপ উচ্চারণ নিজেই দুর্গামাহাত্ম্যের বিকৃতি ঘটায়। তদুপরি সাকার সাধনায় রূপের বা আকারের বিশাল তাৎপর্য আছে। জনমানসে নিরাকার ঈশ্বরের চরম প্রকৃতি উপলব্ধ হয় না। রূপ ছাড়া ঈশ্বরকে সাধনা করা কোন সার্বিক কল্যাণের পথে নিয়ে যায় না, নিয়ে যায় একটা একমুখী খণ্ডিত ধারণায় এবং অপরকে ঘৃণা, অসহিষ্ণুতা ও তজ্জনিত চরম নরসংহার ও গণহত্যার দিকে আমরা যা প্রত্যক্ষ করেছি বিগত দেড়-দুই সহস্র বছরে।

আবার আসি থিমপুজো নামের এই চরম শ্রদ্ধাবিহীন শব্দবন্ধে। দুর্গা ও অন্য চার দেবদেবীর শান্ত, স্নিগ্ধ,স্বর্গীয় দ্যুতিময় দীপ্ত, দৃপ্ত, দীপ্র মুখ তাঁদের দৈব ক্ষমতার প্রতীকি মহিমা স্ফূর্ত হয় তাঁদের প্রতিমায়। থিমপুজোয় প্রায়ঃশই বৃহৎ পুজোমণ্ডপগুলোতে দেখা যায় এক সাধারণ নারী ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত, ক্ষুধার্ত অবয়ব, কোলে এক শীর্ণ ক্ষুধার্ত শিশু দুর্ভিক্ষপীড়িত। দেশে খাদ্যপ্রতুলতা, দারিদ্র-দূরীকরণ আনতে দুর্গার আকারে কেন আঘাত? এর গূঢ় অভিসন্ধি আছে। শিশুকিশোর ও তরুণ প্রজন্মের মানসনেত্র থেকে খুব ধীর লয়ে দুর্গাকে ও অন্য দেবদেবীর মূর্তির ধারণাকে মুছে দেওয়া। ফলতঃ এক সময়ে দুর্গাপুজো এবং অন্যান্য দেবদেবীর পুজো ব্যাপারটাই গৌণ হয়ে যাবে এবং হিন্দু শাস্ত্রীয় পুজো বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

দুর্গাপূজা হল গৃহস্থের জন্য শক্তি-সাধনা। আপনি দেবীকে কন্যা হিসেবে (কেবল মাতা হিসেবে নয়) আহ্বান করেন—তিনি কৈলাস থেকে চার দিনের জন্য তাঁর পিত্রালয়ে আসেন। আপনি নিজের ভেতরের মহিষাসুরকে বধ করার জন্য নিজের শক্তিকে জাগ্রত করেন; এর মাধ্যমে সমৃদ্ধি ও জ্ঞান লাভ করেন এবং পরিশেষে 'বিজয়া' বা নিজের ওপর জয়লাভ করেন।

বর্তমানে আমরা দুর্গাপূজাকে একটা সাংস্কৃতিক উৎসব হিসেবে দেখি। কিন্তু শাস্ত্রে এটা কোন সামাজিক অনুষ্ঠান নয়—এটা একটা সাধনা।

শাস্ত্রে দুটি দুর্গাপূজার উল্লেখ রয়েছে : চৈত্র মাসে রাজা সুরথ ও ঋষি মার্কণ্ডেয় কর্তৃক অনুষ্ঠিত মূল পূজা (মার্কণ্ডেয় পুরাণে এর উল্লেখ আছে।)

শারদ দুর্গাপূজা/অকাল বোধন : রাবণ বধের আগে দেবীর আশীর্বাদ লাভের জন্য আশ্বিন মাসে শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক অনুষ্ঠিত পূজা। বাংলায় আমরা বর্তমানে এই পূজাই পালন করি। রাবণও দেবীর আরাধনা করেছিলেন। তখন দেবী নিদ্রামগ্ন ছিলেন। তাই রামকে অকাল বোধন (অসময়ে জাগরণ) করতে হয়েছিল। এ কারণেই একে 'অকাল বোধন' বলা হয়। দেবী যখন নিদ্রিত থাকার কথা, তখন তাঁকে জাগিয়ে তোলা হয়। তাই এই পূজার মন্ত্রগুলো অন্যান্য পূজা থেকে ভিন্ন।

কেন তিন দিন? এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব : শাস্ত্র অনুযায়ী দেবী তিনটি শক্তির রূপ : মহাকালী—সপ্তমী : তমোগুণ ও ভয়ের বিনাশকারী। তিনি উগ্রা। প্রথমেই ভয়কে জয় বা বিনাশ করতে হয়। মহালক্ষ্মী—অষ্টমী : ভারসাম্য, সম্পদ ও সাহসের দাত্রী। তিনি সৌম্যা। মহাসরস্বতী—নবমী : জ্ঞান ও মুক্তির দাত্রী। তিনি জ্ঞানস্বরূপা। দশমী—বিজয়া দশমী : আত্মা ও পরমাত্মার মিলন। এটাই প্রকৃত বিজয়া। এ কারণেই অষ্টমী তিথিতে অঞ্জলি দেওয়া বাদ দেওয়া যায় না; কারণ অষ্টমী হল শক্তির চরম শিখর বা সর্বোচ্চ পর্যায়।

দুর্গা কেন চার সন্তানসহ আসেন?

গণেশ—সিদ্ধি; সাফল্য। লক্ষ্মী—শ্রী; সমৃদ্ধি। সরস্বতী—মেধা; প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি। কার্তিক—বল; শক্তি। শাস্ত্র বলে, এই চারজন ছাড়া শক্তি (দেবী) অবস্থান করতে পারেন না। দেবীর অবস্থানের জন্য গৃহে এই চারজনেরই উপস্থিতি প্রয়োজন। তাঁর ১০টি হাত মানে ১০টি দিক এবং ১০টি ইন্দ্রিয় (৫টি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও ৫টি কর্মেন্দ্রিয়)। তিনি সকল দিক ও সকল ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করেন।

প্রকৃত তাৎপর্য : মার্কণ্ডেয় পুরাণ বা দেবীমাহাত্ম্যে বলা হয়েছে : ''যা দেবী সর্বভূতেষু...''—সেই দেবী যিনি সকল প্রাণীর মধ্যে চেতনা, ক্ষুধা, নিদ্রা ও শক্তিরূপে বিরাজমান। দুর্গাপূজা মানে বাইরের কোন প্রতিমাপুজো

নয়; এটি হল অন্তরের দুর্গাকে—অর্থাৎ মূলাধারে সুপ্ত ‘কুণ্ডলিনী শক্তি’কে—জাগিয়ে তোলা। ‘অকালবোধন’ হল অসময়ের সংকটে নিজের ভেতরের শক্তিকে জাগ্রত করা।

মহিষাসুর কোন শিং-ওয়ালা রাক্ষস নয়। শাস্ত্র অনুযায়ী, মহিষ + অহংকার, অর্থাৎ মহিষের মতো একগুঁয়ে অহংকার। সে রূপ পরিবর্তন করতে পারে—কাম, ক্রোধ বা লোভের রূপে। দেবী আপনার অন্তরের সেই অসুরকেই বিনাশ করেন।

সিংহ : ধর্ম। ধর্মের ওপর আরোহণ করলেই শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

কেন বলিদান, কেন সিঁদুর খেলা?

পশু বলি মূলত ছিল রিপুবলি—অর্থাৎ ছয়টি রিপু বা অরি-র (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য) বলিদান। বর্তমানে মানুষ প্রতীকী বলি হিসেবে কুমড়ো উৎসর্গ করে।

দশমীতে সিঁদুর খেলা : বিদায়লগ্নে বিবাহিত নারীরা দেবীকে সিঁদুর ও মিষ্টান্ন নিবেদন করেন, কারণ দেবী কৈলাশে ফিরে যাচ্ছেন। শাস্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, সিঁদুর হলো ‘শক্তি-তত্ত্ব’; এর আদান-প্রদান দীর্ঘ ও সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য শক্তির আদান-প্রদানকেই নির্দেশ করে।

শাস্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল কথা : দুর্গাপূজা হল গৃহস্থের জন্য শক্তি-সাধনা। আপনি দেবীকে কন্যা হিসেবে (কেবল মাতা হিসেবে নয়) আহ্বান করেন—তিনি কৈলাশ থেকে চার দিনের জন্য তাঁর পিত্রালয়ে আসেন। আপনি নিজের ভেতরের মহিষাসুরকে বধ করার জন্য নিজের শক্তিকে জাগ্রত করেন; এর মাধ্যমে সমৃদ্ধি ও জ্ঞান লাভ করেন এবং পরিশেষে ‘বিজয়া’ বা নিজের ওপর জয়লাভ করেন। এ কারণেই ষষ্ঠীতে ‘কল্পারম্ভ’ আবশ্যিক—সেদিন হিন্দুরা সংকল্প করেন : “আমি আমার শক্তিকে জাগ্রত করব।”

সুতরাং অবিলম্বে শাস্ত্রিক পূজা ফিরিয়ে আনা হোক। থিমপূজো হিন্দুধর্ম অবমানার সামিল। ■

পরিষদ বার্তা

শিলিগুড়িতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মার্গদর্শক মণ্ডলীর ঐতিহাসিক বৈঠক
সনাতন সংস্কৃতি রক্ষা ও সমাজ জাগরণের ডাক

শিলিগুড়ি : আধ্যাত্মিক ভাবগাম্ভীর্য ও সনাতন সমাজকে সুসংগঠিত করার সুদৃঢ় সংকল্পের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হল বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত মার্গদর্শক মণ্ডলীর গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। গত ২২শে আগস্ট শিলিগুড়িস্থিত শ্রীশ্রীরাধামাধব সুন্দর মন্দির (ইসকন) প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই সভায় উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ প্রান্ত থেকে সাধু-সন্ত ও ধর্মাচার্যদের এক অভূতপূর্ব সমাবেশ ঘটে।

অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় বৈদিক ঐতিহ্য মেনে গুরুকুলের ছাত্রীদের সুরেলা ও মাঙ্গলিক ভজন-কীর্তনের মধ্য দিয়ে। সাদা পোশাকে সজ্জিত ছাত্রীদের পরিবেশিত ভক্তিগীতি সমগ্র সভাকক্ষে এক দিব্য ও স্নিগ্ধ পরিবেশের সৃষ্টি করে। এরপর ইসকন মন্দিরের মূল সভাকক্ষে ‘U-আকৃতি’-তে সজ্জিত বিশেষ মঞ্চে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন মঠ, মন্দির, আশ্রম ও আখড়া থেকে আগত শতাধিক প্রবীণ ও নবীন সাধু-সন্ত, মহন্ত এবং শীর্ষ ধর্মাচার্যগণ আসন গ্রহণ করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন পরম পূজনীয় স্বামীজীবৃন্দ সহ বরেণ্য নির্গুণানন্দজী মহারাজ এবং পরিষদের বরিষ্ঠ কার্যকর্তাগণ।

বৈঠকে সনাতন সমাজের বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ রূপরেখা নির্ধারণে দীর্ঘ আলোচনা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে বেশ কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরাকে আধুনিক প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া, সনাতন মূল্যবোধে সমৃদ্ধ ঐতিহ্যবাহী গুরুকুল শিক্ষা ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন, গ্রামীণ অর্থনীতি ও পরিবেশ সুরক্ষায় গোশালা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও গো-সেবার বিস্তার এবং প্রতিটি প্রত্যন্ত গ্রামে সৎসঙ্গ সপ্তাহের মাধ্যমে ব্যাপক ধর্ম জাগরণ অভিযান পরিচালনা করা। উপস্থিত সন্তরা স্পষ্ট বার্তা দেন যে, জাতীয় মূল্যবোধ ও মানবিক অবক্ষয় রোধে আধ্যাত্মিকতার প্রচারই একমাত্র পথ।

সভায় আগামী কর্মসূচি প্রসঙ্গে ঘোষণা করা হয় যে, পরম শ্রদ্ধেয় অশোক সিংহলজির জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর শিলিগুড়িতে একটি ঐতিহাসিক ও সুবিশাল সন্ত সম্মেলনের আয়োজন করা হবে। এছাড়াও সন্ত শিরোমণি গুরু রবিদাসজীর ৬৫০তম জন্মজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র আবির্ভাব তিথি জন্মাষ্টমীকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে বিশ্বজুড়ে মহাসমারোহে পালনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সমাবেশে উপস্থিত সন্ত সমাজ সনাতন সংস্কৃতির ঐতিহ্য রক্ষা ও সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ধারাবাহিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান এবং আগামী প্রতিটি পদক্ষেপে সক্রিয় ও সর্বাত্মক সহযোগিতার দৃঢ় আশ্বাস প্রদান করেন।

শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি থেকে সমাজের ঐক্য

শুভাশীষ মল্লিক

জন্মাষ্টমী ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে কেন্দ্র করে একটি গল্প

একদিন বৃন্দাবনের এক ছোট্ট ছেলে তার দাদুকে জিজ্ঞাসা করল—''দাদু, আমরা প্রতি বছর জন্মাষ্টমী পালন করি। কিন্তু শুধু পুজো, উপবাস আর আনন্দ করলেই কি জন্মাষ্টমীর উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়?''

দাদু মৃদু হেসে বললেন, ''না রে। জন্মাষ্টমী শুধু শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন নয়, এটা আমাদের নিজেদের নতুন করে জাগিয়ে তোলার দিন।''

ছেলেটি অবাক হয়ে বলল, ''নিজেদের জাগিয়ে তোলা মানে?''

দাদু বললেন, ''যখন সমাজে অন্যায় বাড়ে, মানুষে মানুষে দূরত্ব বাড়ে, দুর্বল মানুষ একা হয়ে যায়—তখন শ্রীকৃষ্ণ আমাদের শেখান, অন্যায়ের সামনে চুপ করে থাকা নয়; সত্য ও ধর্মের পক্ষে দাঁড়াতে হবে।''

তারপর দাদু একটি গল্প বললেন।

এক গ্রামে অনেক পরিবার বাস করত। সবাই ছিল ভালো মানুষ। কিন্তু তাদের মধ্যে ছিল ছোট ছোট বিভেদ। কেউ কারও বাড়িতে যেত না, কেউ কারও বিপদে পাশে দাঁড়াত না।

একদিন গ্রামের একজন বৃদ্ধ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর চিকিৎসার জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন হল। কিন্তু তিনি একা ছিলেন। সবাই জানত তাঁর কষ্টের কথা, কিন্তু কেউ এগিয়ে এল না। সেই সময় গ্রামের কয়েকজন যুবক একত্রিত হল। তারা বলল, ''আমরা যদি সবাই আলাদা আলাদা থাকি, তাহলে আমাদের শক্তি কোথায়? শ্রীকৃষ্ণ তো আমাদের শিখিয়েছেন—কর্তব্য থেকে পিছিয়ে যাওয়া নয়।''

তারা প্রত্যেকে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করল। কেউ অর্থ দিল, কেউ ওষুধ আনল, কেউ হাসপাতালে নিয়ে গেল, কেউ পরিবারের পাশে দাঁড়াল। কয়েক দিনের মধ্যেই বৃদ্ধ সুস্থ হয়ে উঠলেন।

বৃদ্ধ চোখের জল মুছে বললেন, ''আজ আমি বুঝলাম, কৃষ্ণের বাঁশির আসল সুর কী। বাঁশির নিজের কোন অহংকার নেই—সে শুধু সুর দেয়। আর সেই সুরে সবাই একত্রিত হয়।''

দাদু তখন নাতিকে বললেন, ''এই হল জন্মাষ্টমীর শিক্ষা। শ্রীকৃষ্ণ আমাদের শুধু যুদ্ধের কথা বলেননি, তিনি কর্তব্যের কথা বলেছেন। তিনি শুধু ভক্তির কথা বলেননি, তিনি কর্মের কথা বলেছেন। তিনি শুধু নিজের কথা ভাবতে বলেননি, সমাজের কথা ভাবতে শিখিয়েছেন।''

আজ আমাদের সমাজেও সেই ঐক্যের প্রয়োজন।

এই জায়গাতেই বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সেবা, সংস্কার ও সংগঠনের ভাবনা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সমাজের মানুষকে একত্রিত করা, দুর্বল মানুষের পাশে দাঁড়ানো, শিক্ষা ও সংস্কারের মাধ্যমে সমাজকে শক্তিশালী করা; এসব কাজের মধ্য দিয়েই আমরা শ্রীকৃষ্ণের কর্মের আদর্শকে বাস্তব জীবনে ধারণ করতে পারি।

আজ জন্মাষ্টমীর দিনে আমাদের সংকল্প হোক—

আমি শুধু কৃষ্ণের জন্মদিন পালন করব না, কৃষ্ণের আদর্শকে জীবনে পালন করব। অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করব। দুর্বলকে দেখলে পাশে দাঁড়াব। সমাজে বিভেদ নয়, ঐক্য তৈরি করব। নিজের জন্য নয়, সমাজ ও দেশের জন্যও কাজ করব।

কারণ—''যেখানে কর্তব্য আছে, সেখানে কৃষ্ণের শিক্ষা আছে। যেখানে সেবা আছে, সেখানে কৃষ্ণের ভাবনা আছে। যেখানে ঐক্য আছে, সেখানেই শক্তিশালী সমাজ।''

তাই আজ আমরা সবাই একসঙ্গে বলি—

জয় শ্রীকৃষ্ণ! হিন্দু সমাজ ঐক্যবদ্ধ হোক!

ভারত মাতা কি জয়! ■

গুরু প্রণাম

গোপাল চক্রবর্তী

আষাঢ় মাসের (জুন-জুলাই) পূর্ণিমা তিথিতে গুরু পূর্ণিমা পালিত হয়। এই দিন আধ্যাত্মিক ও শিক্ষা গুরুকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপন করা হয়। দেবীপুরাণ অনুসারে—

দেবাগ্নিগুরুবিদ্যায়াঃ পূজয়াঃ সাদৃশং ফলম্।
গুরুস্তেষাং ভবেৎ পূজ্যঃ সর্ব্বকাশপ্রসাধকঃ।। ১
(দেবীপুরাণ, অগস্ত উবাচ)

অগস্ত বলেছেন—দেবতা, অগ্নি, গুরু এবং বিদ্যা পূজনে সমান ফল। কিন্তু তন্মধ্যে গুরু বিশেষতঃ পূজ্য। গুরুই অভিষ্ঠের সাধক।

বিদ্যাগ্নি দেবতা নাঞ বিশেষ ঔপদেশিকঃ।
যথার্থন্যায়বাদিচ সন্দেহবিনিবর্তকঃ।। ২

অর্থাৎ, গুরু বিদ্যাদির উপদেষ্টা, গুরু যথার্থ ন্যায়বাদী ও সন্দেহ নিবর্তক।

দেবীপুরাণের ১২৫তম অধ্যায়ে ঋষি অগস্ত আরও বলেছেন—''গুরু বাক্য বিচক্ষণের শ্রদ্ধেয়। গুরু বাক্যে অশ্রদ্ধা করলে অধোগামী হয়। অতএব সর্বতোভাবে শিবস্বরূপ, গুরুপূজা কর্তব্য দেবীপূজা ক্রমে গুরুপূজা করা মানবের বিহীত। সুর্ব, গো, ভূমি, গৃহ, মণ্ডপ, শয্যা, আসন, বিদ্যা সমস্তই গুরুকে দেবে। পৃথিবীর সর্বোত্তম বস্তু গুরুকে দেওয়া কর্তব্য। গুরু সন্তোষে সকলই পাওয়া যাবে। এইসব দানে অসমর্থ হলে, গুরুর ইচ্ছা অনুযায়ী ধন ভক্তি সহকারে দান কর্তব্য। দক্ষ, নল, পার্থ, জন্মেনজয় এবং অন্যান্য মহাত্ম্য গনের গুরু ভক্তি কিছুতেই কম হয়নি। সেই অবিচলিত ভক্তির প্রভাবেই বিঘ্নকারীরাও শেষে বরদাতা হয়েছেন।”

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের জন্মতিথি (আষাঢ়ের পূর্ণিমা) গুরু পূর্ণিমা হিসাবে পালিত হয়। আসমুদ্র হিমাচল এই দিনটি শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করে থাকে। ব্যাসদেবের জন্ম যেমন রহস্যে ভরা, তেমনি তাঁর কর্মও বিচিত্র। নির্জন দ্বীপে মহর্ষি পরাশরের ঔরসে ধীবর কন্যা মৎস্যগন্ধার গর্ভে তাঁর জন্ম। দ্বীপে জন্ম এইজন্য তিনি ‘দ্বৈপায়ন’, ওঁনার গাত্রবর্ণ কালো এইজন্য ‘কৃষ্ণ’, আর তাঁর অমরকীর্তি সমগ্র ভারত পরিক্রমা করে বেদমন্ত্র সংকলন এবং যথা যথার্থ বিভাজন এইজন্য তিনি ‘বেদব্যাস’। মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস।

অতি শৈশবে মাতৃ আজ্ঞা নিয়ে তিনি গঙ্গা তীরে কর্ণভদ্রতীর্থে পিতা মহর্ষি পরাশরের তপোবনে চলে আসেন। বিদায় কালে মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, যেখানেই থাকুন মায়ের আহ্বানে তিনি মাতৃসকাশে আগমন করবেন এবং নির্দ্বিধায়, বিনা প্রশ্নে মায়ের আজ্ঞা পালন করবেন। পিতা মহর্ষি পরাশরের অত্যন্ত প্রিয় শিষ্য মেধাবী দ্বৈপায়ন অল্প বয়সেই বেদবিদ্যার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। অনেক কঠিন বিষয়ও সহজে সমাধান করতে পারেন। পিতা পরাশর তাঁর প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁর ইচ্ছা এবার দ্বৈপায়ন গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করে দ্বার পরিগ্রহ করুক। কিন্তু দ্বৈপায়ন সমগ্র বেদ শাস্ত্র অধিগত হওয়ার আগে গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করতে সম্মত নন। কিন্তু সমগ্র বেদবিদ্যা অধিগত করা সাধারণের সাধ্যাতীত। পিতা পরাশর জানালেন বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ জম্বুদ্বীপের গহন অরণ্যে দুর্গম প্রান্তরে বেদচর্চায় রত আছেন। সম্ভবত জম্বুদ্বীপে এমন কোন ঋষি নেই, যিনি সমগ্র বেদ অবগত হয়েছেন। ইতিপূর্বে কিছু ঋষি, কিছু কিছু বেদমন্ত্র সংগ্রহ এবং বিন্যাস করে ‘বেদব্যাস’ উপাধি লাভ করেছিলেন। জম্বুদ্বীপে কোন ঋষি সমগ্র বেদ অবগত নন জেনে, দ্বৈপানের খুব আক্ষেপ হল। তিনি চিন্তা করলেন, যেভাবেই হোক, সমগ্র বেদ তাকে অধিকত করতেই হব। কিন্তু পিতা পরাশরের মন সায় দিল না, কিশোর পুত্রকে বেদ মন্ত্র সংগ্রহের জন্য বিপদ সংকুল পথে ঠেলে দিতে। কিন্তু দ্বৈপায়ন তার প্রতিজ্ঞায় অনড়। অবশেষে পিতা তাঁকে আপন অভীষ্ট সাধনের জন্য নৈমিষারণ্যে গমনের সম্মতি দিলেন।

মহর্ষি বেদব্যাস বেদ মন্ত্রের স্রষ্টা নন, দ্রষ্টা। তিনি বেদ চতুষ্টয়ের রচয়িতা নন, সংকলক। সর্বকল্পে বর্তমান বেদমন্ত্র সমূহ তাঁর পূর্ব কালেও বিদ্যমান ছিল। বেদ সংকলনের জন্য তিনি বেদব্যাস নামে বিশ্বের কাছে চিরপূজ্য। তিনি নারায়ণের অবতার স্বরূপ। ভূমিগুণ ও কালগুণ লাভ করে বৃক্ষ যেমন বহু শাখায় বিস্তৃত হয়, তেমন ভাবেই বেদবৃক্ষ লাভ করে তিনি বহু শাখায় বিভুষিত হয়েছিলেন। মহর্ষি বেদব্যাস বেদ উদ্ধার করে, বেদকে ঋক, সাম, যজু, অথর্ব এই চার ভাগে ভাগ করেও নিশ্চিন্ত

হতে পারলেন না। ব্রহ্মবিদ্যার প্রসারের জন্য তিনি উপযুক্ত শিষ্য সংগ্রহ করে বেদ বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগলেন। এই অনুশীলনের ফলে বেদ কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডে এবং কর্মকাণ্ড সংহিতা ও ব্রাহ্মণে, জ্ঞান কাণ্ডআরণ্যক, উপনিষদে বিভক্ত হল। সেই গৌরবোজ্জ্বল ভারতবর্ষে মানুষের জীবন সাধনা ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চার আশ্রমে বিভক্ত ছিল। মহর্ষি বেদব্যাস তেমনই অধিকারী ভেদে সাধনার বিবর্তনের জন্য চার আশ্রমের উপযোগী করে বেদ বিভক্ত করেছিলেন। ব্রহ্মচর্য আশ্রমের জন্য বেদের মন্ত্র অংশ সংহিতা ভাগ স্বাধ্যায় কণ্ঠস্থ করার জন্য নির্দিষ্ট করলেন। গার্হস্থ্য আশ্রমে বেদের ব্রাহ্মণ বিধানে স্বস্ত্রীক যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট হল। ভোগ অবসানে বাণপ্রস্থ আশ্রমে আরণ্যকের নির্দেশে ব্রহ্মচিন্তায় সম্মোহিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল। সবশেষে সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবোজ্জায় বিবেক বৈরাগ্য সম্পন্ন হয়ে উপনিষদ বেদান্তের অনুশীলনে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সমিচিন সুব্যবস্থা করে মুক্তির পথ নির্দেশ করেছিলেন। বেদের শেষ বা অন্ত বেদান্ত উপনিষদের সার সংকলন করে মহর্ষি বেদব্যাস মুমুক্ষু মানব সম্প্রদায়ের পরম ও চরম মঙ্গল বিধান আর অমৃতত্ব প্রদানের জন্য ব্রহ্ম নিরূপনের যে সূত্র সমষ্টি প্রণয়ন করলেন, তাই ব্রহ্মসূত্র।

এই সমস্ত কার্যের সঙ্গে সঙ্গে মহর্ষি ভাবছেন, অজ্ঞ লোকের মধ্যে কিভাবে ধর্মভাব জাগ্রত করা যেতে পারে? সেই সময়ে সমাজ বিকৃতি ও পঙ্কিলতায় পরিপূর্ণ হয়েছিল। সদুপদেশ তাদের কাছে রুচিকর ও হৃদয়গ্রাহী হবে না। তবে গল্প শুনতে আপামর সকলেরই অভিরুচি থাকে। যদি সাধারনের চিত্তাকর্ষক কথাগুলো গল্প রচনা করে তাতে কৌশলে ধর্মকথা নির্দিষ্ট করা যায় এবং স্পষ্টভাবে উপদেশ না দিয়ে দৃষ্টান্ত দ্বারা সুফল ও অসৎ কাজের কুফল জ্বলন্ত রূপে বুঝিয়ে দেওয়া যায়, তাতে মানব সমাজের হিত সাধিত হতে পারে। এরূপ চিন্তা করে মহর্ষি ক্রমে কয়েক খানা গ্রন্থ রচনা করলেন। গল্পগুলো প্রায়শ পুরাতন ঘটনা অবলম্বনে ঘটনা অবলম্বনে লিখিত হয়েছে বলে, মহর্ষি এগুলোকে 'পুরাণ' নামে আখ্যায়িত করেছিলেন।

সেই দ্বাপর যুগেও যে সর্ব-বর্ণ সমন্বয়ে এবং বর্ণ নির্বিশেষে যোগ্য ব্যক্তিকে সম্মানিত করার প্রথম প্রচেষ্টা মহর্ষি ব্যাসদেবের মধ্যে দেখতে পাই। ব্যাসদেব যখন নৈমিষারণ্যে পুরাণ পাঠ আরম্ভ করেন, তখন সুত সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি দূরত্ব বজায় রেখে একপাশে বসে নির্দিষ্ট মনে পাঠ ও ব্যাখা শ্রবণ করতেন। সেই সময় সুত জাতি প্রতিলোম বলে সমাজে নিন্দিত ছিল। এই ব্যক্তি অন্য কারও সঙ্গে বাক্যালাপ করতেন না। দীর্ঘকাল পাঠশ্রবণের পর, তাঁর ইচ্ছা হল মহর্ষিকে তিনি পুরাণ পাঠ করে শোনাবেন। একদা নিভৃতে মহর্ষির কাছে সেই সুত ব্যক্তি এই প্রস্তাব দিলেন। মহর্ষি নির্দ্বিধায় রাজি হলেন। তার সুললিত কণ্ঠে এবং সরস ব্যাখ্যায় পুরাণ পাঠ শুনে, পরম তৃপ্ত হলেন মহর্ষি। এরপরই সেই সুতকে, মহর্ষি তাঁর অনন্য শিষ্যদের মতো পুরাণ পাঠ এবং ব্যাখ্যার জন্য অনুমতি দিলেন। অন্যান্য শিষ্যরা এতে আপত্তি করলে, মহর্ষি যুক্তি দিয়ে বোঝালেন—ধর্মকথা যে কোন ব্যক্তির মুখ থেকে শোনা যেতে পারে। আর যে ব্যক্তি ধর্মকথা শোনাবে সে ব্যাসাসনেও বসতে পারে। বৃক্ষমূলে বসে সুত পুরাণ পাঠ আরম্ভ করলেন। ক্রমে দেখা গেল, ব্যাসদেবের অন্যান্য শিষ্যদের থেকেও সুত-এর পাঠ এবং ব্যাখ্যা শোনার জন্য জনসমাগম বেশি হচ্ছে। পরবর্তীকালে ব্যাসদেবের রচনা হিসেবে, যে অষ্টাদশ পুরাণ প্রচলিত হয়েছে, তার মধ্যে অনেক পুরাণের বক্তা হিসেবে সুতকে পাওয়া যায়। যেমন কোন কোন পুরাণে উল্লেখ আছে 'বৈশম্পায়ন উবাচ' তেমনি কোন কোন পুরাণে উল্লেখ আছে 'সুত উবাচ'।

আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের প্রতিটি জনপদে বেদব্যাস শ্রদ্ধেয় এবং অতি পরিচিত নাম। ব্যাস রচিত অষ্টাদশ পুরাণের কাহিনি তখন লোকের মুখে। সত্যের জয় এবং পাপের বিনাশ এই আদর্শ বেদব্যাস মানুষের অন্তরে স্থাপন করতে পেরেছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সারা ভারতের মানুষ তার প্রমাণও পেয়েছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাহিনি নিয়ে ব্যাসদেবের মূল মহাভারত তখন রচিত হয়েছে। তবে পরবর্তীকালে মহাভারতের প্রচুর অংশ প্রক্ষিপ্ত এবং রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান আকার প্রাপ্ত হয়েছে। তেমনি ব্যাসদেবের নামে প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণ এবং উপপুরাণেও যুগে যুগে বহু অংশ প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যাসের নামে প্রচলিত সহস্র স্তবস্তুতি সবগুলি মূলত ব্যাসদেব রচিত কিনা সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ কিছু কিছু রচনার মান ব্যাসের মূল রচনার সমমানের নয়। তবে তিনি সর্বকালের এমন একটি জনপ্রিয় নাম, তাঁর নামে প্রচলিত যে কোন রচনাই জনপ্রিয় হয়েছে।

ত্রিশত বর্ষেও জরা মহর্ষিকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাঁর অভিলাষ আর একবার ভারত পরিক্রমা করার। তাই

কতিপয় শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বেড়িয়ে পড়লেন। জনপদের পরিবর্তন হয়েছে, জনসংখ্যা বেড়েছে, ধর্ম বিমুখ মানুষ ধর্মমুখী হয়েছে, এইসব দেখে ব্যাসদেব তৃপ্ত হলেন। ভিন্ন স্থানে বহু দেবালয় গড়ে উঠেছে। বহু নগর, বহু তীর্থ পরিক্রমা করে সশিষ্য ব্যাসদেব উপস্থিত হলেন, ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন তীর্থ কাশি ধামে। এই তীর্থে ব্যাসদেব আগেও এসেছেন, তবে এবার দেখলেন কাশির প্রভুত উন্নতি হয়েছে। ব্যাসের আগমন সংবাদে নগরবাসী উল্লসিত। বিশ্বনাথের মন্দিরে উপস্থিত ভক্তবৃন্দের অনুরোধে ব্যাসদেব তাৎক্ষণিকভাবে এক শিবস্তুতি রচনা করে সর্বসমক্ষে পাঠ করলেন। কাশি ধামের প্রবীন ও নবীন পণ্ডিত পুরোহিতদের সঙ্গে কথা বলে মহর্ষি অনুধাবন করলেন, কাশিধাম সম্পূর্ণরূপে শৈব সম্প্রদায়ের করতলগত। অন্য চার সম্প্রদায় যথা—বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর ও গানপত্যরা এখানে ব্রাত্য। শৈবরা অন্য চার সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রু মনভাবাপন্ন। স্বয়ং ব্রহ্মবাদী হয়েও মহর্ষি বিষ্ণু, শিব, দেবী, সূর্য ও গণপতির নামে পঞ্চপুরাণ রচনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রকৃত উদারপন্থী। কাশিধামের উগ্র সাম্প্রদায়িকতা মহর্ষির হৃদয়কে ব্যথিত করে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এই সাম্প্রদায়িকতা একদিন ভারতবর্ষের আর্য ধর্মকে বিপন্ন করবে।

গঙ্গার অপর তীরে জনহীন প্রান্তরে যদি উদার মানব মতাবলম্বী আর একটি তীর্থ স্থাপিত হয়, তবে ধর্মের যে সাম্প্রদায়িক ত্রুটি তা বহুলাংশে প্রশমিত হতে পারে। তীর্থযাত্রীরা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার সঙ্গে উদারপন্থী ধর্মমতের সহাবস্থান দেখতে পাবেন। মহর্ষির মনোভাব প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে উদারপন্থী ব্যক্তি, শ্রেষ্ঠী, সাধারণ মানুষ, সকলেই নতুন নগর নির্মাণের জন্য নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সচেষ্ট হলেন। অল্পদিনের মধ্যে গড়ে উঠল ভবন, মার্গ, পুষ্করণী, বিপণী। গড়ে উঠল দেবালয়, স্থাপিত হল নতুন বসতি। কাশির সম্প্রদায়িক পণ্ডিতগণ প্রমাদ গুণলেন। ব্যাসের কাশি প্রতিষ্ঠিত হলে বিশ্বনাথের কাশির গুরুত্ব কমে যাবে। কাজেই ব্যাসের কাশি যাতে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়, তার জন্য সচেষ্ট হলেন তাঁরা। প্রচার করতে শুরু করলেন, শিবের কাশিতে মৃত্যু হলে শিবলোক প্রাপ্ত হয়, আর ব্যাসের কাশিতে মৃত্যু হলে নির্ঘাত গর্ধব হবে। ইদৃশ কুবাক্য ইতর জনের মুখে মুখে ঘুরছে। মহর্ষি মানুষের এহেন নিচুতায় ব্যথিত হলেন। যে মানুষের মানসিক উন্নতির জন্য মহর্ষি জীবন যাপন করছেন, সেই মানুষের নিচুতায় বিচলিত হলেন দূরদর্শী মহর্ষি। আর্য ধর্মের ভবিষ্যৎ ভেবে উদ্বিগ্ন হলেন তিনি, চিন্তিত হলেন এই উগ্র সম্প্রদায়িকতা একদিন ভারতের সার্বিক ঐক্য বিনষ্ট করে দেশকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে দেবে। ভগ্ন মনোরথ হয়ে কাশি থেকে বদরিকাশ্রমে প্রত্যাবর্তন করলেন মহর্ষি। কথিত আছে প্রায় চারশত বছর বেঁচে ছিলেন ব্যাসদেব। আবার কারো মতে তিনি অমর।

মহর্ষি ব্যাসদেবের পুরাণ প্রচার আপামর ভারতবাসীদের মনে ধর্মের বিচারবোধ জাগ্রত করেছে, অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করেছে, সর্বোপরি নির্মল আনন্দ দিয়েছে। এই পরম্পরা হিসেবে পরবর্তীকালে সমাজে যাত্রা, কীর্তন, কথকতা এসব শিক্ষা কথা বিনোদন মূলক সংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের উদ্ভব হয়েছে। সমাজের এক শ্রেণীর মানুষের জীবিকার পথ সুগম হয়েছে। পরবর্তী সময়ে বিশেষত বিগত এবং বর্তমান শতাব্দীতে পুরাণাশ্রিত অসংখ্য যাত্রা, নাটক এবং সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ধর্মপথে ব্যাসদেব ছিলেন উদার মতাবলম্বী। তাঁর ধর্মমত ছিল সম্পূর্ণ এবং সর্বতমুখ। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পরমেশ্বরের কাছে তিনি তিনটি বিষয়ে নিজেকে অপরাধী মনে ক্ষমা ভিক্ষা করছেন—

রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎকল্পিতং।
স্তুত্যা নির্ব্বচনীয়তা খিলওরোদূরীকৃতা যন্ময়া।।
ব্যপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতা যতীর্থ রোর্দুরীকৃতা যন্ময়া।
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতা দোষএয়ং মৎকৃতং।।

অর্থাৎ হে জগদীশ তোমার রূপ না থাকা সত্ত্বেও অর্থাৎ ‘‘আমি যে ধ্যানাদি দ্বারা রূপ কল্পনা করিয়াছি এবং স্তুতি রচনা করিয়া তোমার যে অনির্বচনীয়তাকে দূরীকৃত করিয়াছি, তুমি সর্বব্যাপী হইলেও তীর্থযাত্রাদিদ্বারা যে তোমাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছি, আমার এই তিনটি অপরাধ ক্ষমা করতে হইবে।’’

ভারতবাসীর জন্য তিনি যে অমূল্য সম্পদ রেখে গেছেন, যুগ ধর্মের নিরিখে তা অতুলনীয়। ভারতবাসী তাঁকে গুরুর সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। তাই তাঁর পূণ্য জন্মতিথি আষাঢ়ের পূর্ণিমা তিথিকে ‘গুরু পূর্ণিমা’ রূপে মান্যতা দেওয়া হয়েছে।

ত্বাং বেদশাস্ত্র পরিনিষ্ঠিত শুদ্ধ বুদ্ধিং
চর্মাবরং কৃষ্ণতাত্বিষং মুনিভিঃপুজিতং।।
কনক-পিঙ্গলজটা-কলাপং কবিন্দ্রং।
ব্যাসং নমামি শিরসা তিলকং ঋষিনাং।। ■

মনসা জয়ন্তী

আলপনা ঘোষাল

মনসা জয়ন্তী বা মনসা পূজা হিন্দু ধর্মের লৌকিক সর্পদেবী মা মনসার আরাধনা ও উৎসব। এটি মূলত শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে বিশেষ করে বর্ষাকালে যখন সাপের উপদ্রব বা ভয় বেশি থাকে, তখন মূলত সাপের হাত থেকে রক্ষা, সন্তান লাভ এবং মঙ্গল কামনায় পালিত হয়। বাংলায় নাগপঞ্চমী ও সংক্রান্তির দিনে এই পুজো বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

মনসা (সংস্কৃত : মনসা) হলেন একজন পৌরাণিক হিন্দু সর্প বা নাগদেবী। মহাভারত সহ দেবী ভাগবত পুরাণ, আদি অনেক পুরাণে দেবী মনসার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রধানত পূর্ব-ভারতীয় অঞ্চল অবিভাজিত বঙ্গদেশ, অঙ্গদেশ, মিথিলা, কামরূপ এবং উৎকলে যে কোন বিষধর প্রাণীর হাত থেকে রক্ষা ও বিষের প্রতিকার পেতে, প্রজনন ও ঐশ্বর্য লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর পুজো করা হয়।

মনসা শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ 'মনসা' থেকে। যার অর্থ হল 'মন'। তিনি সাপের দেবী, বিষ প্রজ্ঞা এবং প্রাকৃতিক শক্তির প্রতিনিধিত্ব করেন। হিন্দু লৌকিক পুরাণ এবং মনসামঙ্গল কাব্য অনুসারে দেবী মনসার জন্ম সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান জনপ্রিয় কাহিনি হল, শিবের মন বা বীর্য থেকে উৎপন্ন ঋষি কশ্যপের মানস কন্যা রূপ এবং নাগরাজ বাসুকী রাজা তাকে লালন পালন করেছেন।

মনসামঙ্গল কাব্য ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী দেবাদিদেব মহাদেবের তেজ ও বীর্য্য পদ্ম ফুলের উপর নিসিক্ত হলে সেখান থেকে এক দিব্য কন্যারূপ প্রকাশ পায়। পদ্মপাতায় জন্ম বলে তাঁর অপর নাম হয় 'পদ্মাবতী'। বাসুকী মাতা কন্যারূপে প্রতিপালন করেন এবং নাগদের অধীশ্বরী করে দেন। শিবের মানসকর্মের জন্য জন্ম হওয়ায় শিব কন্যার নাম রাখেন 'মনসা'। ব্রহ্মজ্ঞান দান করে শিব মনসাকে ঘরে নিয়ে এলে শিব-পত্নী চণ্ডী তাঁকে সতীন ভেবে ভুল করেন এবং কুশের বাণ দিয়ে মনসার এক চোখ কানা করে দেয়। মনসাও বিষ ছুঁড়ে চণ্ডীকে মেরে ফেলেন, কিন্তু সবার অনুরোধে আবার প্রাণ ফিরিয়ে দেন। চণ্ডীর রোষ থেকে মনসাকে বাঁচাতে শিব তাঁকে 'সিজুয়া' পর্বতে কন্যা নেতার কাছে রেখে এলেন। সমুদ্রমন্থন কালে উত্থিত বিষ পান করে মৃতবত হয়ে পড়লে চণ্ডীর অনুরোধে মনসা শিবের বিষ হরণ করেন। তখন থেকে মনসার দেব সমাজে সম্মানের স্থান পেলেন।

দেবী মনসার বিবাহ হল জারুৎকারু মুনির সঙ্গে। যদিও তিনি ব্রহ্মচারী থাকতে চেয়েছিলেন, তবুও তিনি পূর্বপুরুষদের প্ররোচনায় মনসাকে বিবাহ করলেন, কারণ তারা জানতেন, তিনি সন্তান না দিলে, পূর্ব পুরুষরা নরকে পতিত হবেন। কিন্তু এই বিবাহ ব্যর্থ হয় এবং দম্পতিদের মধ্যে প্রায় কোন মানসিক বন্ধনই গড়ে ওঠেনি। মনসার অপরাধ ছিল, মনসা একবার জারুৎকারুকে গভীর নিদ্রা থেকে জাগিয়ে তুলেছেন, তাতে জারুৎকারু অপমানিত বোধ করে তাকে ত্যাগ করেছিলেন। তবে চলে যাওয়ার আগে মা চন্ডীর অনুরোধে তিনি মনসাকে আশীর্বাদ করেন, তার ফলে 'আস্তিকার' জন্ম হয়।

হিন্দু মহাকাব্য মহাভারত অনুসারে জারুৎকারু যাযাবর ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি সেই বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিলেন। মহাকাব্যে তার নামের ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'জরা' মানে ক্ষয় এবং 'কারু' মানে দানবীর। তাঁর দেহ ঋষির কঠোর তপস্যার মাধ্যমে হ্রাস ক্ষয় হয় করেছিলেন।

মনসাকে ভক্ত বৎসল বলে বর্ণনা করা হলেও তাঁর পূজা করতে অস্বীকার করা হয়। তাঁর জন্ম সংক্রান্ত কারণে মনসার পূর্ণ দেবীত্ব প্রথমে অস্বীকার করা হয়েছিল। তাই মনসার উদ্দেশ্য ছিল দেবী হিসেবে নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করা এবং একটি একনিষ্ঠ মানব ভক্তমণ্ডলী গড়ে তোলা। তাঁর সঙ্গে মিশরীয় দেবী 'আইসিসের' মিল রয়েছে। মনসার কাহিনী পঞ্চদশ শতাব্দী শেষ হবার আগেই পরিপূর্ণ পাঁচালী রূপ ধারণ করেছিল। এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় বিপ্রদাস পিপলাইয়ের 'মনসাবিজয়' কাব্যে। বিপ্রদাসের কাব্য রচিত হয়েছিল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। বাস্তু দেবতা, আরোগ্যের দেবতা, অথবা সম্পদের দেবতা বিভিন্ন নামে মনসার পূজা এদেশে বারবার চলে এসেছে। এখন ইনি বিশেষ করে সাপের দেবতা, তবে নিজে সাপ নন। আরোগ্য, পুষ্টি, শ্রী, ইনি গৌরী যিনি জল কেটে একপদী, দ্বিপদী, চতুষ্পদী, অষ্টাপদী, নবমপদী সৃষ্টি করেছিলেন। ইনিই বাক যিনি নদীরূপে গন্ধর্বের ছলনা করে দেবতাদের সোম এনে দিয়েছিলেন, যা অমৃত। দেবীর এই প্রসন্ন রূপ কিন্তু বাংলা সাহিত্যে গোঁড়া থেকে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। এখানে মনসা

চণ্ডীর প্রতিদ্বন্দ্বী, শিবভক্তের বিদ্বেষিনী।

মনসামঙ্গল কাব্যের প্রধান দেবতা সর্প দেবী মনসা। তিনি মূলগত ভাবে অনার্য দেবী। ভারতের আদিবাসী ও অন্ত্যজ সমাজে সর্প দেবী মনসার পূজা সুপ্রচলিত। বিশেষজ্ঞদের অনুমান খ্রিস্টিয় দশম-একাদশ শতাব্দীতে বাংলায় মনসার পূজা প্রবর্তিত হয়। পদ্মপুরাণ, দেবীভাগবত পুরাণের মতে কয়েকটি আধুনিক পুরাণ গ্রন্থে দেবী মনসার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থগুলো অবশ্য খ্রিস্টিয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত হয়নি। অলৌকিক দেবী হলেও কালক্রমে মনসা ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক হিন্দু সমাজে প্রতিপত্তি অর্জন করে। এমনকি চৈতন্যদেবের সমসাময়িককালে শিক্ষিত বাঙালি সমাজেও মনসা পূজা প্রচলিত হয়।

মনসামঙ্গল একটি আখ্যানকাব্য। এই কাব্যের প্রধান আখ্যানটিও আবর্তিত হয়েছে মর্ত্যলোকে মনসার নিজ পূজা প্রচারের প্রয়াসকে কেন্দ্র করে। কাব্যের মূল উপজীব্য চাঁদ সদাগরের উপর দেবী মনসার অত্যাচার, চাঁদের পুত্র লক্ষীন্দরের মৃত্যু এবং পুত্রবধূ বেহুলার আত্মত্যাগের উপাখ্যান। এই কাব্যে সে যুগের হিন্দু বাঙালি সমাজের সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনীতি, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি সম্পর্কে নানা পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পাওয়া যায়। চাঁদ সদাগর শুধুমাত্র এই কাব্যেরই নয় বরং সমগ্র বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বলিষ্ঠ চরিত্র। বেহুলা-লক্ষীন্দরের করুণ উপাখ্যানটিও তাঁর মানবিক আবেদনে বাঙালি জীবনে জনপ্রিয়।

মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কবি 'কানাহরি দত্ত'। বিজয়গুপ্ত এই কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। অন্যান্য কবিদের মধ্যে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, বিপ্রদাস পিপলাই প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আধুনিক কালে মনসামঙ্গল অবলম্বনে বিশিষ্ট নাট্যকার শম্ভু মিত্র, 'চাঁদবণিকের পালা' নামে একটি নাটক রচনা করেছিলেন। চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনে ধারাবাহিকের আকারে চিত্রিত হয়েছে মনসামঙ্গল।

বিশিষ্ট মঙ্গলকাব্য বিশারদ আশুতোষ ভট্টাচার্য মনসামঙ্গল কাব্যের আখ্যান ভাগটিকে 'রামায়ণ-মহাভারত' পুরাণের নিরপেক্ষ একটি স্বাধীন 'লৌকিক কাহিনি' বলে বর্ণনা করেছিলেন। খ্রিস্টিয় দশম-একাদশ শতাব্দীতে বাংলায় মনসার মূর্তি নির্মাণ শুরু হয়। মনসামঙ্গল কাব্যের মূল লৌকিক কাহিনিটি তারও আগে থেকে পল্লীগীতি ছিল বলে অনুমান করা হয়। খ্রিস্টিয় একাদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে এই লোককথাটি শক্তিশালী কবিদের নিপুণ হাতে পরে কাব্যকৃতি রূপ নেয়। ক্রমে তার মধ্যে নানা উপকাহিনী এবং পৌরাণিক উপাখ্যানের সমাবেশ ঘটে।

বাংলার প্রাচীন মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদ সদাগরের সঙ্গে মনসার দ্বন্দ্ব এবং শেষ পর্যন্ত দেবী প্রচারের কাহিনি বিখ্যাত। শিবের মহাভক্ত চাঁদ জগৎপিতা শিবের থেকে মহাজ্ঞান লাভ করেছিলেন। মানুষের পূজা ব্যতীত দেবত্ব অর্জন সম্ভব নয়, তাই মনসা চাঁদের কাছে পূজা চাইলেন। শিব ভিন্ন অপর কাউকে পূজা করতে চান না, তাই চাঁদ তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। এমনকি পত্নী সনকার পাতা মনসার ঘট হেতাল দণ্ডের বাড়ি মারেন। পরিণামে মনসা কৌশলে চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করেন এবং তাদের ছয় পুত্রকে বিষ দংশনে হত্যা করেন। কিন্তু এরপরও চাঁদ সওদাগর তাঁর ধন্বন্তরির অলৌকিক ক্ষমতা বলে, নিজেকে রক্ষা করতে থাকেন। ধন্বন্তরি চাঁদের থেকেও অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন ছিলেন। সুন্দরী নারীর ছদ্মবেশে মনসা ধন্বন্তরিকে হত্যা করেন। এরপর চাঁদ যথার্থই অসহায় হয়ে পড়েন। ভগ্নহৃদয় নিয়ে চাঁদ বাণিজ্যে যাওয়ার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু শত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও তিনি আবার বাণিজ্যে বের হন। কিন্তু মনসা সেই সফল বাণিজ্য তরী সপ্তডিঙা মধুকর ডুবিয়ে চাঁদকে সর্বশান্ত করে দেন। চাঁদের সঙ্গীরা মারা যান। কিন্তু মনসার অনুরোধে শিব চাঁদকে প্রাণে রক্ষা করেন। এরপর মনসা চাঁদকে ভাসিয়ে সমুদ্রের চন্দ্রকেতুর কাছে পৌঁছে দেন। চন্দ্রকেতু চাঁদকে দিয়ে মনসার পূজা করানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু চাঁদ তাতে সম্মত হয় না। ফলে তাকে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে হয়। তা সত্ত্বেও তিনি শিব-দুর্গা পূজা করে চলেন। মনসা তখন স্বর্গের দুই নর্তকী দম্পতি অনুরুদ্ধ এবং ঊষার সহায়তা নেন। তাঁদের একজন চাঁদ সদাগরের পুত্ররূপে এবং অপরজন চাঁদের বন্ধু সায়বেনের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন।

এদিকে চম্পক নগরী ফিরে এসে চাঁদ কোনক্রমে নিজের জীবন পুনরায় সাজিয়ে তুলতে সক্ষম হন। তাঁর লক্ষিন্দর নামে একটি পুত্র জন্ম নেয়। অন্যদিকে সায়বেনের স্ত্রী একটি কন্যার জন্ম দেয়, তার নাম রাখা হয় বেহুলা। দুজনেই একসঙ্গে বেড়ে ওঠেন। তাদের অভিভাবকেরা দুজনের বিবাহের কথা চিন্তা করেন, কিন্তু কুষ্টি মিলিয়ে দেখা যায় বিবাহের রাত্রেই, বাসর ঘরে সর্পাঘাতে লক্ষীন্দরের মৃত্যু কথা লেখা আছে। কিন্তু মনসার ভক্ত বেহুলা ও লক্ষীন্দর ছিলেন রাজযোটক। তাই শেষ পর্যন্তই উভয়ের বিবাহ হয়। লক্ষীন্দরের প্রাণ রক্ষা করতে চাঁদ লৌহ বাসন নির্মাণ করেন।

কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। এত সুরক্ষা সত্ত্বেও মনসা ঠিক পথ বের করে বাসর ঘরে একটি সাপ পাঠিয়ে লক্ষীন্দরের

প্রাণনাশ করেন। সেই যুগে প্রথা ছিল, সর্প দংশনে মৃত্যু হলে মৃত ব্যক্তিকে দাহ না করে, কলার ভেলায় করে ভাসিয়ে দেওয়া হতো। বেহুলা তার মৃত স্বামীর সঙ্গ নেন। সকলেই বারণ করেন, কিন্তু বেহুলা কারো নিষেধ শোনেন না। ছয় মাস ধরে বেহুলা ভেলায় ভাসতে থাকেন। এই সময়কালে তিনি গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে চলেন। লক্ষীন্দরের মৃতদেহে পচন ধরে। গ্রামবাসিরা তাঁকে উন্মাদ মনে করে। বেহুলা মনসার কাছে প্রার্থনা করতে থাকেন। কিন্তু মনসা শুধু ভেলাটিকে ডুবিয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করেন না।

কলার ভেলায় ভাসতে ভাসতে, বেহুলা মনসার সহচরী নেতার ঘাটে এসে ভিড়লো। সেই ঘাটেই কাপড় কাঁচত নেতা। বেহুলার প্রার্থনা শুনে নেতা ঠিক করলেন যে, সে তাকে নিয়ে যাবেন মনসার কাছে। নিজের অলৌকিক ক্ষমতা বলে তিনি বেহুলা ও মৃত লক্ষীন্দরকে স্বর্গে উপস্থিত করেন। মনসা বেহুলাকে বলেন, 'যদি তোমার শ্বশুরকে দিয়ে আমার পূজা করাতে পারো, তবে তুমি তোমার স্বামীর প্রাণ ফিরে পাবে।' বেহুলা শুধু বলেন, 'আমি করবোই।' আর তাতেই তার মৃত স্বামীর দেহে প্রাণ সঞ্চারিত হয়। তাঁর পচাগোলা দেহের অস্থি-মাংস পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। তিনি চোখ মেলে তাকান এবং বেহুলার দিকে তাকিয়ে হাসেন।

নেতা তাঁদের মর্ত্যে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। বেহুলা তার শাশুড়িকে সব ঘটনা বিবৃত করেন। তিনি চাঁদ সদাগরকে গিয়ে সব কথা জানানোর পর, চাঁদের পক্ষে তার আর না বলা সম্ভব হয় না। কিন্তু তিনি শর্ত দেন যে হাতে তিনি শিব পুজো করেছেন, সেই হাতে তিনি মনসার পুজো করবেন না। প্রতিমাসে কৃষ্ণ একাদশী তিথিতে চাঁদ সওদাগর মনসার পূজা করতে সম্মত হয়, কিন্তু মনসা তাকে যে কষ্ট দিয়েছিল তা তিনি সম্পূর্ণ ক্ষমা করতে পারেন না, তিনি বাম হাতে পিছনে মুখ ফিরিয়ে মনসাকে পূজা করেন। মনসা এতেই সন্তুষ্ট হন। তিনি চাঁদের সমস্ত ধন-সম্পদ ফিরিয়ে দেয়। এরপর চাঁদ সওদাগর ও তার পরিবার সুখে শান্তিতে বাস করতে থাকে। চাঁদের ছয় পুত্রকেও মনসা জীবন দান করেন। মর্ত্যবাসীর মেয়াদ ফুরাতেই বেহুলা-লক্ষীন্দর আবার ইন্দ্রের সভার স্থান পেল। চাঁদ সওদাগরের মতো ধনী ও প্রভাবশালী বণিক মনসার পূজা করায় মনসার পূজা বৃহত্তর জনসমাজে প্রচার লাভ করে।

মনসা সর্পের দেবী। তিনি সর্প কুলের জননী। মনসার মূর্তিতে, তাঁকে সর্প-বেষ্ঠিত নারীরূপে দেখা যায়। তিনি একটি হংস বা পদ্মের উপর বসে থাকেন। তাঁর বাহন হাঁস এবং সাপ। তাঁর চার হাত। তার উপরের দুটি হাতে থাকে পদ্ম ও নিচের দুটি হাতে থাকে সাপ। আটটি সাপের ফণা তাঁর মাথার উপর ছাউনির আকারে বিরাজ করে। দেবীর এই অষ্টনাগ হল—অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলির, কর্কট ও শঙ্খ। এই অষ্টনাগ একদিকে যেমন অষ্টাবিধ সিদ্ধির কথা বোঝায়, তেমনি অষ্টপাশের কথাও বোঝায়।

বাংলার নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের কাছে মনসা একজন গুরুত্বপূর্ণ প্রজনন দেবতা। তারা মহাসমারোহে মনসার পুজো করে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে, শ্রাবণ মাসে মনসার পূজা উপলক্ষে হয় পালাগান 'সয়লা'। এই পালার বিষয় হল, পদ্মপুরাণ বা মনসা মঙ্গল। সারারাত ধরে গায়ক দয়ার সহ, পালা আকারে সয়লা গায়। পুরুলিয়ার মনসা পূজায় হাঁস বলি দেওয়া হয়। রাঢ় বাঁকুড়ায় জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে দশহরা বা ব্রত পালন করে মনসা পুজো করা হয়। তখন এখানে ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগিতা হয়। মনসা পুজোর অঙ্গ হল, 'অরন্ধন'। রাঢ়ে চৈতন্যদেবের সময়কালে মনসাকে মা দুর্গার এক রূপ মনে করা হতো। তাই কোন কোন জায়গায় পুজোর সময় বলি দেওয়া হতো। আজও অনেক পূজায় পাঠা বলি দেয়। তবে সাপের দেবী মনসার পূজায় পাঠা বলি মূলত লৌকিক এবং তান্ত্রিক বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যেখানে দেবীকে তুষ্ট করতে এবং হিংসা ও ক্রোধের প্রতীক হিসেবে বলি দেওয়ার বিধান মানা হয়। বেদ বা মূল শাস্ত্রে এর কোনো বাধ্যতামূলক নির্দেশ নেই। বর্তমানে অনেক স্থানে পশুর বদলে ফল বা সবজি বলি দেওয়ার প্রচলন দেখা যায়।

মনসা পূজা প্রধান ও প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো হল আটটা ঘট। এই মনসা ঘট হল গর্ভবতী নারীর প্রতীক। যেখান থেকে প্রাণের সঞ্চার হয়ে মানব জীবন ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে। মনসা ঘট যেমন গর্ভবতী নারীর প্রতীক, তেমনই ফসলের উর্বরতার প্রতীক। যাকে প্রজনন শক্তির প্রতীক হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। প্রথা অনুসারে ঘটের উপরে আটটা গামছা, মনসা গাছ বা সিজ গাছ মূলত রাখতে হয়। মনসার প্রধান নৈবেদ্য হল পাকা কলা ও ঠাণ্ডা দুধ। এটি মনসা পূজার গুরুত্বপূর্ণ ভোগ। ফুলের মধ্যে রক্তজবা, পদ্ম বা শালুক ফুল এছাড়া নানা রকম সাদা ও হলুদ ফুল পুজোর কাজে লাগে। কিন্তু মনসা পুজোতে ধুনো দেওয়ার প্রচলন নেই, মানা হয় ধুনোর গন্ধে দেবী উগ্র হন। বর্তমানে সর্বজনীন ভাবে মনসা দেবীর পূজা করা হয়। আবার পারিবারিক পর্যায়ে পারস্পরিক ভাবে এবং পারিপার্শ্বিক মন্দিরেও মনসা দেবীর পূজা হয়। ■

ভগবান বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার : বামন অবতার

পারমিতা পাল

ভগবান বিষ্ণুর দশটি অবতারের মধ্যে পঞ্চম অবতার হচ্ছেন, ভগবান বামন। যিনি ক্রেতা যুগে দেবমাতা অদিতির গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছিলেন। দেবমাতা অদিতি স্বামী কাশ্যপ ঋষির আদেশে ১২ বছর ধরে বিধিপূর্বক তপস্যা করেন। ওঁনার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান শ্রীবিষ্ণু শ্রাবণ মাসের দ্বাদশী তিথির দিনে অভিজিৎ নক্ষত্রে প্রকট হলেন। বৃহস্পতি ওঁনাকে গায়ত্রী মন্ত্র শেখালেন। একইভাবে অন্যান্য দেবতারা ওঁনাকে কিছু না কিছু প্রদান করলেন। মাতা অদিতি ওঁনাকে, লাল বস্ত্রের লাঙ্গোট প্রদান করলেন।

সত্যযুগে দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে সংগ্রাম হয়। সেই যুদ্ধে প্রহ্লাদ পৌত্র রাজা বলি, পরাজিত হয়ে যান। তখন রাজা বলি অসুরদের গুরু শুক্রাচার্যকে সন্তুষ্ট করে এমন শক্তির অধিকারী হলেন, যার দ্বারা তিনি স্বর্গলোককে অধিকার করে নেন। তারপর অসুর গুরু শুক্রাচার্য রাজা বলিকে বিধিপূর্বক শতক্রতু বানানোর উদ্দেশ্যে অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। এই আয়োজনের ফলে দেবতারা ব্যাকুল হয়ে (দেবতাদের) মাতা অদিতির কাছে গিয়ে তাদের ভয় ও ব্যথাকে জানালেন। তখন মাতা অদিতি বললেন, 'আমার পুত্র অপূর্বালী (বামন অবতার), তোমাদের এই বিপদ থেকে পরিত্রাণ দেবে।'

মাতার আদেশে ভগবান বিষ্ণু বামন ব্রহ্মচারী ব্রহ্মণের রূপে তার দণ্ড কমণ্ডলু এবং মৃগ চর্ম ধারণ করে পৃথিবীলোকে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। রাজা বলি তাঁর শততম (১০০টি) অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন, সেই মণ্ডপে যাচক রূপে বামন ব্রাহ্মণ বালক উপস্থিত হলেন। রাজা বলি অত্যন্ত দানশীল রাজা ছিলেন। তিনি ব্রহ্মচারী বামন বালককে তাঁর প্রয়োজন অনুসারে দান চাইতে বললেন। তখন বামন রূপধারী শ্রীবিষ্ণু বললেন, 'রাজন আমি একজন ব্রাহ্মণ, নিষ্কামভাব নিয়ে জীবন যাপন করি। তাই আমার কোন বস্তুর আবশ্যকতা নেই, তদাপি তুমি যদি আমাকে কিছু দান দেবার ইচ্ছা রাখ, তাহলে আমাকে আমার পায়ের তিন ভাগ সমান জমি দান করলে আমি সেখানেই আমার বিশ্রাম স্থল বানাবো।'

অন্যদিকে দৈত্যদের গুরু শুক্রাচার্য, ভগবান বিষ্ণুকে চিনে ফেললেন এবং তার অভিপ্রায় বুঝে তাঁর শিষ্য বলিকে উক্ত দান না দেওয়ার জন্য, বারবার সতর্ক করেন। কিন্তু দৈত্য রাজ বলি তাঁর দানশীলতাকে, কলঙ্কিত না করার জন্য বামন ব্রাহ্মণকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেন। দানের এই সংকল্প করা মাত্রই বামন অবতার, শ্রীবিষ্ণু তাঁর বিরাট রূপ ধারণ করে, প্রথম পায়ে পৃথিবী, দ্বিতীয় পায়ে স্বর্গলোক এবং ব্রহ্মলোক মাপ করে নিলেন। তৃতীয় পা রাখার স্থল না থাকায়, রাজা বলি তাঁর দেহকে প্রস্তুত করে দিলেন। বামন অবতার বিষ্ণু, বলি রাজার মাথায় তৃতীয় পা রাখতেই, রাজা বলি পাতাল লোকে পৌঁছে যায়। বলির দানশীলতা দেখে ভগবান বিষ্ণু তাঁকে বর চাইতে বললেন। তখন রাজা বলি চাইলেন যে, যখনই তিনি চাইবেন তখনই যেন ভগবান বিষ্ণু তাঁর কাছে থাকেন। ভগবান বিষ্ণু রাজা বলিকে পাতাল লোকের স্বামী বানিয়ে নিজে দ্বার পালের কাজে নিযুক্ত হলেন। বাস্তবে ভক্তি উপহার দিলেন বামন অবতার শ্রীবিষ্ণু।

রাজা বলির দ্বারপাল হওয়ার জন্য শ্রীবিষ্ণু ক্ষীর সাগরে ফিরতে পারলেন না। অনেকদিন ব্যতীত হয়ে গেলে, মাতা লক্ষ্মী এক ব্রাহ্মণ স্ত্রী রূপ ধারণ করে রাজা বলির সভায় উপস্থিত হয়ে কান্নাকাটি শুরু করেন। তখন রাজা বলি ওঁনার সন্তাপ করার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। স্ত্রী রূপী মাতালক্ষ্মী বলেন, তিনি বড় অসহায়, তার কেউ নেই। তখন রাজা বলি বললেন, 'ঠিক আছে, আজ থেকে তুমি আমার ভগিনী হবে।' মাতালক্ষ্মী তখনই রাজা বলির হাতে রাখি পরিয়ে দিলেন। ভাই রাজা বলি, বোনকে উপহার চাইতে বললেন। উপহার স্বরূপ মাতালক্ষ্মী, রাজা বলির দ্বার পাল শ্রীবিষ্ণুকে চেয়ে নিলেন। সবকিছু বুঝেও রাজা বলি ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে তাঁর স্নেহ বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেন। তাঁর এই বচন বদ্ধতাকে দেখে, মাতালক্ষ্মী বরদান করেন, 'যতদিন তোমার রাজত্ব থাকবে, ততদিন তোমার কোনো অভাব অনটন হবে না। ধন-সম্পদ সবসময় তোমার থাকবে।' কথিত আছে এই ভ্রাতৃ-সূত্র বন্ধনকে পরবর্তী সময়ে রক্ষাবন্ধনরূপে পৃথিবীতে পালিত হয়।

এই রাখি উৎসব পূর্ণিমা তিথিতে পালন করা হয়।

ভাই বা দাদার হাতে রক্ষাসূত্র পরিয়ে, তিলক কেটে, বোন বা দিদি, তার ভাইদের মঙ্গল কামনা করে থাকেন। ভাই বা দাদা তার শক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে বোনকে উপহার প্রদান করে, সর্বদা রক্ষা করার অঙ্গীকার করে থাকেন। বাস্তবে রাখিবন্ধন উৎসব ভাই-বোনেদের উৎসব, কিন্তু ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আটকানোর জন্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলার বুকে সামাজিক সমরসতা নির্মাণের জন্য রাখি বন্ধন উৎসব পালন করেছিলেন। তারপর থেকেই এই উৎসব, সার্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে সামাজিক সুরক্ষা নির্মাণের উদ্দেশ্যে। আর.এস.এস এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদ রাখি বন্ধন উৎসবকে সমাজের মধ্যে পালন করে একতার সূত্র নির্মাণ করে থাকে। ■

বামন অবতার : সত্য, দান ও ধর্মরক্ষার গৌরবগাথা

মনোজ শা

শ্রীমদভাগবত পুরাণের অষ্টম স্কন্ধের ১৮তম অধ্যায়ে ভগবান বামন দেবের আবির্ভাব এবং মহারাজ বলির যজ্ঞস্থলে তার আগমন বর্ণিত আছে। এটা শুধু এক ভূমি দানের কাহিনি নয়, এটা ভক্তি, শরণাগতি এবং অহংকার ভঞ্জনের এক অদ্ভুত কাহিনি। বলি মহারাজ অসুর কূলে জন্মগ্রহণ করলেও একজন একনিষ্ঠ শিব ভক্ত ছিলেন। ভক্ত শিরোমণি প্রহ্লাদ তার পিতামহ। তিনি দেবতাদের হাতে পরাজিত হবার পর ভৃগুমুনির সান্নিধ্যে বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করেন এবং এর ফলে তিনি বিভিন্ন অমূল্যবস্তু লাভ করেন, যেমন দিব্য স্বর্ণ রথ, এই রথ বায়ুর গতিকেও হার মানায়, সিংহ চিত্র যুক্ত পতাকা, এমন এক পতাকা যার ভিতর অঙ্কনরত সিংহ যখন ডাক দেয়, তখন শত্রুসৈন্য পালাতে শুরু করে। এছাড়াও বিশেষ ধনুষ এবং অক্ষয় তুণীর, যার তীর কখনো শেষ হয় না, এবং রক্ষাকবজ লাভ করেন এইরূপে তিনি অজেয়ও হয়ে উঠেন। তার ফলস্বরূপ এবং মহর্ষি শুক্রাচার্যের আশীর্বাদে ইন্দ্রদেবকে পরাজিত করে তিনি স্বর্গ রাজ্যের উপর অধিকার করে নেন। তখন দেব মাতা অদিতি ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন, ভগবান তখন নিজেকে তার পুত্ররূপে প্রকট হবার এবং স্বর্গ রাজ্য পুনরুদ্ধারের প্রতিশ্রুতি দেন। ভগবানের আবির্ভাব কালে তার শরীর ছিল শ্যাম বর্ণ এবং তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারণ করেছিলেন, এরপর ভগবান বামন রূপে মহারাজ বলির উদ্ধারকল্পে তার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হন।

ভগবান যখন বামন রূপ ধারণ করেন, তখন সূর্যদেব তাঁকে গায়ত্রী মন্ত্রের দীক্ষা দেন। পিতা কাশ্যপ মুনি তাকে কটিবন্ধ প্রদান করেন, মাতা অদিতি বস্ত্র প্রদান করেন, ধরিত্রী মাতা মৃগ চর্ম প্রদান করেন, চন্দ্রমা তাকে ব্রহ্মদণ্ড প্রদান করেন, ইন্দ্রদেব তাকে ছাতা প্রদান করেন, ব্রহ্মা দেব তাকে কমুণ্ডল প্রদান করেন, মাতা সরস্বতী তাকে রুদ্রাক্ষের মালা প্রদান করেন, কুবের দেব তাকে ভিক্ষাপাত্র প্রদান করেন এবং মাতা পার্বতী তাকে প্রথম ভিক্ষা প্রদান করেন। এইভাবে সুসজ্জিত হয়ে ভগবান, বলি মহারাজের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হন।

বলি মহারাজ তখন নর্মদা নদীর তীরে ভৃগু কচ্ছ নামক স্থানে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। ভগবান তার কাছে ব্রাহ্মণ রূপে উপস্থিত হয়ে ভিক্ষা চান। বলি মহারাজ তাকে, তার যা কিছু প্রয়োজন ধন, রত্ন গরু, রথ, বড় রাজ্য,যাখুশি তাই চেয়ে নেবার কথা বলেন, তখন বামনরূপী বিষ্ণুদেব তার কাছে তিন পা ভূমি প্রদান করার কথা বলেন। তাকে শুধু তিন পা ভূমি নয়, আরো অনেক কিছু গ্রহণ করার জন্য বলি মহারাজ, বামনরূপী বিষ্ণুদেবকে অনুরোধ করেন। কিন্তু বামন দেবতা তিন পা ভূমি ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তখন অসুরদের গুরু শুক্রাচার্য বুঝতে পারেন ইনি কোন সামান্য ব্রাহ্মণ পুত্র নন, ইনি স্বয়ং বিষ্ণু, ইনি দান গ্রহণের জন্য আসেননি, ইনি বলি মহারাজের সমস্ত কিছু কেড়ে নেবার জন্য এসেছেন। তাই তিনি বলি মহারাজকে ভিক্ষা দানে বিরত থাকার জন্য বারবার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন যে ভগবান বিষ্ণু দান গ্রহণের জন্য আসেননি, তিনি বলি মহারাজের সমস্ত কিছু কেড়ে নেওয়ার জন্য এসেছেন। এটা শুনে বলি মহারাজ বলেন সত্যি যদি তিনি স্বয়ং বিষ্ণু হন, তাহলে আমার থেকে বেশি সৌভাগ্যবান আর কে? যার কাছে ভগবান স্বয়ং ভিক্ষা করতে এসেছেন। তিনি আরও বলেন আমি দান করছি ধর্মের জন্য, যাতে আমার এই গৌরবশালী

বংশের মানহানি না ঘটে। প্রতিশ্রুতি পূর্ণ না করার পাপ আমি করতে পারব না, সর্বোপরি আমি দান করছি ব্রাহ্মণকে। এই কথা বলে বলি মহারাজ জল হাতে নিয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, বামনদেবের কথামতো তিন পা জমি দান করার জন্য। তক্ষুণি বামন দেবতা বিরাট রূপ ধারণ করেন এবং দেখা যায় সারা সৃষ্টি তার মধ্যে সমাহিত। ভগবান তার দু'পা দিয়ে সমগ্র পৃথিবী এবং স্বর্গ মেপে দেন। তৃতীয় পা রাখার জন্য আর কোন স্থান না থাকায় বলি মহারাজ নিজের মাথা তৃতীয় পা রাখার জন্য পেতে দেন। এইসব দেখে মহারাজ বলির সৈন্যসামন্তগণ অবুঝের মতো বামনদেবের দিকে আক্রমণে উদ্ধত হয়, তখন বামনদেবের সঙ্গে আগত জয়, বিজয়, নন্দ, জয়ন্তী প্রমুখ দ্বারা সমস্ত অসুরকুলের বিনাশের আশঙ্কায় শুক্রাচার্য তাদের বিরত করেন। তখন গরুড়দেব, মহারাজ বলিকে তার গরুড় পাশে বেঁধে ফেলেন। এই রূপে বলি মহারাজ তার সমস্ত সম্পত্তি এবং জীবন ভগবান বামন অবতারের কাছে সমর্পণ করেন। বাস্তবে ভগবান বিষ্ণুর দ্বারা তিন পা ভূমি, শুধু ভৌতিক মাপ ছিল না, এর ভিতর গভীর আধ্যাত্মিক, দার্শনিক এবং মনোবৈজ্ঞানিক অর্থ আছে।

প্রথম পা—(পৃথিবী) ইহা আমাদের ভৌতিক সংসার শরীর এবং দৃশ্যমান জগতের প্রতীক।

দ্বিতীয় পা—(স্বর্গ) ইহা সূক্ষ্মজগত, মন, ইচ্ছা এবং দেব লোকের প্রতীক।

তৃতীয় পা—(পরমাত্মা) ইহা বিশুদ্ধ চেতনা, আত্মা এবং অন্তিম সত্যের প্রতীক।

ভগবান তার তৃতীয় পা যখন বলি মহারাজের মাথায় রাখেন তার অর্থ হল শুধুমাত্র আত্মসমর্পণই পরম আত্মা প্রাপ্তি একমাত্র পথ। রাজা বলি যখন তার মাথায় তৃতীয় পা রাখার কথা বলেন তখন তিনি নিজের আত্মা এবং স্বয়ংকে সমর্পিত করেন। বলি মহারাজের ভক্তি এবং আত্মসমর্পণ দেখে, ভগবান তাকে সুতোলধাম যা স্বর্গ থেকেও বেশি বৈভবশালী, দান করেন এবং নিজে সেই ধামের প্রহরী হবার কথা বলেন এবং মহারাজকে আশীর্বাদ করেন যে পরবর্তী মন্বন্তরে বলি মহারাজ ইন্দ্র রূপে জন্মগ্রহণ করবেন এবং স্বর্গের রাজা হবেন। মহারাজ বলির ভক্তি আত্মসমর্পণ আমাদের শেখায় যে ভগবানের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং ভক্তি আমাদের জীবনের সমস্ত বাধা দূর করতে পারে এবং আমাদের মুক্তি দিতে পারে। ■

পরিষদ বার্তা

মায়াপুর গৌড়িয়া মঠে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ মধ্যবঙ্গ প্রান্তের মার্গদর্শক মণ্ডলীর বৈঠক

২০শে আগস্ট ২০২৬ বৃহস্পতিবার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান মায়াপুর ধামের গৌড়িয়া মঠে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ মধ্যবঙ্গ প্রান্তের মার্গদর্শক মণ্ডলীর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে সাংগঠনিক ১২টি জেলা থেকে ১৫০-এর বেশি বিবিধ পরম্পরার সন্ত এবং মহাত্মা ধর্মাচার্যগণ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে মার্গ দর্শন করানোর জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা ধর্মাচার্য সম্পর্ক আয়াম প্রমুখ মাননীয় অশোক তিওয়ারিজি এসেছিলেন। সেই সঙ্গে কলকাতা ক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক মাননীয় সোহন সিং সোলাঙ্কি, ক্ষেত্র সম্পাদক মাননীয় অমিয় সরকার উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় মার্গদর্শক মণ্ডলীর প্রমুখ সন্ত শ্রীমৎ বন্ধু গৌরব মহারাজ শ্রীমৎ নির্গুনানন্দ মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী ভক্তিসাধন তৎপর মহারাজ প্রমুখ সন্ত উপস্থিত ছিলেন। কার্যক্রমের সভাপতি হিসেবে স্বামী তিতিক্ষানন্দজি মহারাজ দায়িত্ব পালন করেন। মধ্যবঙ্গ প্রান্তের সম্পাদক মাননীয় তরুণ লায়েক, সংগঠন সম্পাদক মাননীয় বিজয় পাতর, ধর্মাচার্য সম্পর্ক প্রমুখ হেমন্ত মুখার্জী এবং উত্তর নদীয়া জেলার সমস্ত কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে ধর্মান্তরণ প্রতিরোধ বিষয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা হয়। এছাড়া মাননীয় অশোক সিংহলজির জন্মশতবর্ষে সন্তদের ভূমিকা এবং সন্ত রবিদাসের ৬৫০তম জন্মজয়ন্তীতে সন্তদের প্রবাস হিন্দু সংস্কার সংস্কৃতি সংরক্ষণ করার উপর জোর দেওয়া হয়। আগামী ২৯শে ডিসেম্বর ২০২৬ কলকাতা ব্রিগেড ময়দানে দশ লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠের জন্য সমাজে জাগরণ হেতু সমস্ত জেলায় গীতা রথ বের হবে। এই বিষয়ে আরো অনেক চর্চা হয় সমস্ত সন্তমণ্ডলী এবং মার্গদর্শক মণ্ডল হিন্দু জাগরণে সংযুক্ত হয়ে কাজ করবেন এই নির্ণয় হয়। সূচনা দেওয়া হয় ৪ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ বিশ্ব হিন্দু পরিষদ স্থাপনা দিবস পালন করা হবে সেখানে সমস্ত সন্তরা বিভিন্ন জায়গায় উপস্থিত থাকবেন। ২রা অক্টোবর মাননীয় অশোক সিংহলজির জন্মশতবর্ষের মধ্যবঙ্গ প্রান্তের প্রথম কার্যক্রম বর্ধমান নগরে হবে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের তিন দিবসীয় মাতৃশক্তি বর্গ

সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হল বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের তিন দিবসীয় মাতৃশক্তি বর্গ। শিলিগুড়ির শ্রীকৃষ্ণ প্রণামী মন্দিরে গত ৬ আগস্ট সন্ধ্যা থেকে ৯ আগস্ট ২০২৬ সকাল পর্যন্ত এই বর্গের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে মোট ৭২ জন শিক্ষার্থী, পাঁচজন শিক্ষিকা এবং পাঁচজন প্রবন্ধক এই বর্গে অংশগ্রহণ করেন।

রাখি বন্ধন

রবিব্রত ঘোষ

শ্রাবণী পূর্ণিমায় ভাইয়ের হাতে বোনেরা রাখি বেঁধে দেয়। মূলত ভাইয়ের মঙ্গল কামনায় রাখি বাঁধা হয়। অনাত্মীয় ছেলেকেও ভাই বা দাদা বোন মনে করে রাখি পরানোর রেওয়াজ আছে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে কারো মঙ্গলের জন্য এরকম রাখি পরানো। প্রচলন আছে। কিন্তু তা কোন নির্দিষ্টি দিনে না হয়ে যে কোনদিনই করা যেত। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন ৬০০০ বছর আগে রাখি বাঁধার প্রচলন ছিল। প্রাচীন ভারতে রানীরা প্রতিবেশী রাজ্যের রাজাদের সাথে ভাই বোনের সম্পর্ক তৈরি করতে রাখি পড়াতেন। দুর্গা পুজোয় দশমীর দিন বিসর্জনের আগে অপরাজিতা পূজা ও তারপরে অপরাজিতা সুতো পড়ার প্রচলন আছে । বাঙালি সংস্কৃতিতে জামাইষষ্ঠী পালন করা হয়। তারপর জামাইয়ের হাতে সুতো বাধার প্রথা আছে।

হাতে রাখি বাঁধার মধ্যে দিয়ে যেমন করে কারোর মঙ্গল কামনা করা হয় তেমনি তাকে আপন বা নিজের গোষ্ঠীভুক্ত করে নেওয়া হয়। এসব নিয়ে নানা পৌরাণিক কাহিনিও আছে। রামায়ণে ভগবান রাম সমস্ত বানর সেনাদের ফুল দিয়ে রাখি বেঁধে দিয়েছিলেন। মহাভারতে এমন একটি উপাখ্যান আছে। যা উল্লেখ করে ভাই ও বোনের সম্পর্ককে বোঝানো হয়েছে। সুভদ্রা ছিলেন কৃষ্ণের বোন। কৃষ্ণ খুব ভালবাসতেন তাকে। সুভদ্রা একদিন জিজ্ঞাসা করলেন দ্রৌপদীকে স্নেহ করার কারণ কি? কৃষ্ণ বললেন, যথা সময় তুমি ঠিক বুঝতে পারবে। এর কিছুদিন পর একদিন কৃষ্ণের হাত কেটে গেলে সুভদ্রা কৃষ্ণের জন্য নতুন কাপড় এনে হাত বেঁধে দেওয়ার জন্য কাপড় খুঁজতে গেলেন। এর মধ্যে দ্রৌপদী এসে নিজের মূল্যবান কাপড় ছিড়ে তাকে বেঁধে দিলেন। কৃষ্ণ তখন সুভদ্রাকে বললেন, কেন আমি দ্রৌপদীকে এত স্নেহ করি এখন বুঝতে পারলে তো। সুভদ্রা তখন বুঝতে পারলেন, ভক্তি ও পবিত্র ভালবাসা, শ্রদ্ধা কী জিনিস! দাদা কৃষ্ণের চেয়ে মুল্যবান বস্ত্র নিজের কাছে বেশি প্রিয় বলে নিজের বস্ত্র ছিঁড়তে পারেননি, এটা ভেবে সুভদ্রা দারুণ লজ্জিত হয়ে পড়েন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে রাজ্যসভায় পাশা খেলার পর যখন চরম লজ্জাজনক অবস্থায় পড়েছিলেন দ্রৌপদী। তখন তাকে রক্ষা করতে শ্রীকৃষ্ণই এগিয়ে এসেছিলেন। ভাগবত পুরাণ ও বিষ্ণু পুরাণে এরকম অনেকগুলো উপাখ্যান আছে। বলি ছিলেন বিষ্ণুর উপাসক। তার রাজত্ব রক্ষা করতে বিষ্ণু পাতালের তার কাছে চলে গিয়েছিলেন। স্বামীকে ফিরে পাবার কামনায় বিষ্ণুর স্ত্রী লক্ষী সাধারণ মেয়ের ছদ্মবেশে বলি রাজার কাছে চলে আসেন। একদিন রাজার হাতে রাখি বেঁধে দেন এবং এর পরে তাকে সবকিছু খুলে বলেন ও বিষ্ণুকে ফিরে যেতে অনুরোধ করেন। আলেকজান্ডার রাজা পুরুর সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় আলেকজান্ডারের স্ত্রী পুরুর কাছে একটা রাখি পাঠান, যাতে পুরু আলেকজান্ডারের কোন ক্ষতি করতে না পারেন তার প্রার্থনা করেন। পুরুও আলেকজান্ডারের কোন ক্ষতি হতে দেননি।

এরকম আরো একটি জনপ্রিয় গল্প আছে। রানী কর্ণবতী মুঘল সম্রাট হুমায়ুনকে একটা রাখি পাঠান। গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহ তার রাজ্য আক্রমণ করেছেন। রানী কর্ণবতী অসহায় বোধ করছেন। তিনি হুমায়ুনকে রাখি পাঠিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করেন। অভিভূত হুমায়ুনও কর্ণবতী ও তার রাজ্য রক্ষা করার জন্য সেনা প্রেরণ করেছিলেন। ভবিষ্যৎ পুরাণে বলা হয়েছে পশুরদের কাছে পরাজিত হয়ে ইন্দ্র, যখন বৃহস্পতির সঙ্গে আলোচনায় বসেন তখন ইন্দ্র জানিয়েছিলেন এটি তার শেষ যুদ্ধ। হয় তিনি জয়লাভ করবেন, না হলে যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করবেন। এই কথা শুনে ইন্দ্রের স্ত্রী ইন্দ্রানী একটা কবচ বেঁধে দেন আর বলেন যে, এর থেকেই তিনি সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা পাবেন রাজ্য পুনরুদ্ধার করার সময়। এই রাখি বন্ধন ঘটেছিল ঘটেছিল শ্রাবণ পূর্ণিমাতে। অন্য মতে বলা হয় এই আখ্যানটির উল্লেখযোগ্য এটি ভাই বোনের মধ্যে ঘটেনি, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঘটেছিল। হয়তো পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয়ে ভাই বোনের মধ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। রাখিকে অত্যন্ত পবিত্র জিনিস বলে মনে করা হয়। বোনেরা ভাইয়ের দীর্ঘ সুখী জীবন যাপনের প্রার্থনা করতেন আর ভাইরা বোনেদের জন্য প্রতিশ্রুতি দিতেন বিপদে তাদের পাশে থাকার জন্য। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জানুয়ারি মাসে বোনেরা ভাইদের হাতে রাখি বেঁধে দেন আর একটা মন্ত্র বলেন, যার বাংলা মানে দাঁড়ায় যে

মহাশক্তিশালী দানবেন্দ্র রাজা বলিকে বাধা হয়েছিল সেই পবিত্র রক্ষা বন্ধন সূত্র দিয়ে। আমি তোমাকে বাঁধছি, যা সর্বদা তোমাকে রক্ষা করবে।

রাখি বন্ধন অন্য মাত্রা পেয়েছিল রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি ধরে রাখার জন্য রাখি বন্ধনকে ব্যবহার করা হয়েছিল। সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা ছাড়াও যার মধ্যে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতাও অনেক ছিল। ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গের কথা জানান। জানানো হয় কুড়ি অক্টোবর কাজের সুবিধার জন্য বাংলাকে ভাগ করা হবে। যদিও এর মধ্যে দিয়ে বাংলাকে ভাগ করে স্বাধীনতা আন্দোলনকে দুর্বল করাটাই লক্ষ্য ছিল এবং হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করার একটা গোপন ইচ্ছা ব্রিটিশ শাসকদের মধ্যে ছিল। গোটা বাংলা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখরিত হয়ে ওঠে। ওই দিন বাংলার সমস্ত মানুষ বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা সামিল হন। সামিল হন রবীন্দ্রনাথও। তিনি বলেন আইনের সাহায্যে বাংলাকে ভাগ করা হতে পারে, কিন্তু আমাদের মানুষকে কেউ ভাগ করতে পারবে না। সেই কথা মাথায় রেখে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্য তুলে ধরতে বাংলার মানুষ হিসেবে এ দিনটিকে পালন করা হবে। ওই দিন রাখি বন্ধনের দিন হিসেবে তিনি পালন করার ডাক দেন। গঙ্গা স্নান করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালিরা একে অপরের হাতে রাখি পরিয়ে দেবে বলে ঠিক করা হয়। সেই মতো জোড়াসাঁকো থেকে বেরিয়ে প্রতিবাদ মিছিল জগন্নাথ ঘাটের দিকে এগোতে থাকে। মিছিলের পুরো ভাগে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। মিছিলে যারা অংশ নিয়েছিলেন তাদের কণ্ঠে ছিল রবীন্দ্রনাথের লেখা গান, 'বাংলার মাটি বাংলার জল'—যা খুবই বিখ্যাত গান। এছাড়াও ছিল 'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে'। আর ছিল 'তোমরা কি এমন শক্তিমান' এই গানটি।

রবীন্দ্রনাথের পাশেই ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তার স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায়, বেরিয়েছিলেন রাস্তা দু'ধারে বাড়ির মহিলারা ফুটপাতে খই ছড়াচ্ছেন, শাক বাজাচ্ছেন, উলু দিচ্ছেন যেন কোন কিছুর শোভাযাত্রা বেরিয়েছে। ঘাটে সকাল থেকেই লোকে লোকারণ্য। স্নান করে একে অপরের হাতে রাখি বাঁধা হল। রাখি বাঁধা নিয়ে মেতে ওঠেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কেউ ভাবেনি যে একজন হিন্দু একজন মুসলমানের হাতে রাখি বাঁধবে। কিন্তু সেটাও বাস্তবায়িত হল। এরপর শোভাযাত্রা ঘাট থেকে বেরিয়ে চলল চিৎপুরের দিকে। রবীন্দ্রনাথ মসজিদে ঢুকে মৌলভীদের হাতে রাখি পরান। রাখি পরানো নিয়ে কোথাও কোন অসন্তোষ হয়নি।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে বিভিন্নভাবে এই দিনটি পালন করা হয়। পাঞ্জাবি সংস্কৃতিতে রক্ষাবন্ধনের উৎসবটি একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। খালসা বাহিনী পাঞ্জাবে রাখি শব্দটি চালু করেছিল। তারা তাদের ফসলের ভাগের বিনিময়ে মুঘল ও আফগান সেনাদের হাত থেকে জমি কৃষকদের রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। আরেকটু অন্যদিকে তাকালে আরও একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হল মহারানির জিন্দানের নেপালের রাজাকে রাখি পাঠানো। মহারাজ রঞ্জিত সিং শিখ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী মহারানি জিন্দান রক্ষাবন্ধন উদযাপন করতে খুব পছন্দ করতেন। মহারানি জিন্দান নেপালের রাজার কাছে রাখি পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে নিজের বোন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। নেপালে রাজা তাঁকে রক্ষা করার জন্য তাঁর প্রতিজ্ঞাকে সম্মান করেছিলেন এবং শিখ সাম্রাজ্যের পতন হলে তাঁকে নেপালে আশ্রয় দিয়েছিলেন। রাখিবন্ধন উপলক্ষ্যে, আজও অমৃতসর জেলার বাঁকড়ায় অনুষ্ঠিত হয় রাখি মেলা। দক্ষিণ ভারতে এই দিনটিতে নদীতে স্নান করা আগামী দিনগুলো সৎ ও ন্যায়ভাবে কাটানোর জন্য শপথ নেওয়ার দিন। পশ্চিম ভারতে সমুদ্র উপকূলের মানুষেরা সমুদ্রকে শান্ত করার জন্য নারকেল দিয়ে সমুদ্র দেবতাকে পুজো করে। গুজরাটে এই দিন শিবের পূজা করা হয়। বলা হয় এই দিনটিতে যে শিবের পূজা করবে শিব তার সব পাপ ধুয়ে দেবে। কোন কোন মতে শ্রাবণী পূর্ণিমায় শিবলিঙ্গে শিব এবং বিষ্ণু যুগ্ম মূর্তি রূপে আবির্ভূত হন। শৈব পণ্ডিত অভিনব গুপ্তের শৈব দর্শন গ্রন্থে শ্রাবণী পূর্ণিমার মাহাত্ম্য বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। জম্মুতে এই দিন ঘুড়ি ওড়ানো হয়। উত্তরাখণ্ডের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই দিন উপবীত পড়ার কথা আছে। মধ্য ভারতে এই দিনটিকে কাজলি পূর্ণিমা হিসেবে পালন করা হয়। মূলত পুত্রবতী মহিলারা গম গাছের অংকুরকে কেন্দ্র করে এই অনুষ্ঠান পালন করেন। যাতে আগামী বছর আরো ভালো শস্য পাওয়া যায়।

পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে এই দিনটি বলভদ্রের জন্মদিন হিসেবে পালন করা হয়। এইদিন দেবী সুভদ্রা, জগন্নাথ ও বলভদ্রকে রাখি পরান। ■

হিন্দু ধর্মে সাম্যবাদ ও শূদ্র জাগরণ

শতদ্রু পালবাগ

ভারতীয় সভ্যতা বিরোধী শক্তিগুলো পরাধীন ভারতে হিন্দুদের উচ্চ নিচের ভেদাভেদগুলোর সুযোগ নিয়ে বারংবার তার আত্মাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছে ও নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'আমরা যখন ডাকব 'হিন্দু এসো', তখন কে আসবে? আমাদের মধ্যে কত ছোটো ছোটো সম্প্রদায়, কত গণ্ডি, কত প্রাদেশিকতা-এ উত্তীর্ণ হয়ে কে আসবে? কত বিপদ গিয়েছে। কই একত্র তো হইনি। বাহির থেকে যখন প্রথম আঘাত নিয়ে এল মহম্মদ ঘোরী, তখন হিন্দুরা সে আসন্ন বিপদের দিনেতেও তো একত্র হয়নি। তার পর যখন মন্দিরের পর মন্দির ভাঙতে লাগল, দেবমূর্তি চূর্ণ হতে লাগল, তখন তারা লড়েছে, মরেছে, খণ্ড খণ্ড ভাবে যুদ্ধ করে মরেছে। তখনো একত্র হতে পারল না। খণ্ডিত ছিলেম বলেই মেরেছে, যুগে যুগে এই প্রমাণ আমরা দিয়েছি।' (কালান্তর)

স্বামী যুক্তানন্দের (পতিত ও দলিত বন্ধু স্বামী প্রণবানন্দ) মতে আজ স্বাধীনতার এত বছর পরেও সেই দুষ্ট শক্তিগুলোর ক্ষমতা খর্ব হয়েছে। তথাপি তারা করাল দন্ত বিহীন হয়ে যায়নি। তাদের বিষদাঁতের সেই তীক্ষ্ণ-শক্তি দুর্বল হলেও অকেজো হয়ে যায়নি। একদল তথাকথিত বুদ্ধিজীবী—যাঁরা ভারত মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেয় না, তাঁরা আবার এর কারণ-রূপে মাঝে মাঝেই হিন্দুদের কোন কোন শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করে মানুষকে শাস্ত্রবিরোধী করে তোলে। যদিও প্রজ্ঞা-চক্ষু দিয়ে দেখলে আমরা বুঝতে পারি সেই সব ব্যাখ্যাগুলো নিতান্তই হিন্দু ধর্মকে কলুষিত করার একটি সুদীর্ঘ চক্রান্ত মাত্র।

হিন্দু ধর্মের বর্ণাশ্রম প্রথা (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র) কখনোই জন্ম ভিত্তিক নয়, হিন্দু শাস্ত্র শিরোমণি গীতাতে শ্রীভগবান নিজমুখে স্বীকৃতি দিয়েছেন সেই ভাবনাকে, 'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ', (শ্রীশ্রীগীতা)। শ্রীভগবান যে চারবর্ণ সৃষ্টি করেছেন, তা পুরোপুরি গুণ ও কর্ম অনুযায়ী। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ছেলে বলেই যে সে ব্রাহ্মণ হয়ে যাবে এবং শূদ্রের ছেলে বলেই সে শূদ্র হবে সেটা না। ব্রাহ্মণ হয়ে সে যদি ব্রাহ্মণের উচিত কর্ম না করে তবে তার ব্রাহ্মণত্ব লোপ পাবে। একই কথা প্রযোজ্য ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শুদ্রের জন্যও। উদাহরণ স্বরূপ বিশ্বামিত্র, দেবাপি প্রমুখ।

হিন্দু ধর্ম বেদ ভিত্তিক, কিন্তু তাহলেও এই বেদেরই একটি বিশেষ মন্ত্রের মধ্যে শাস্ত্র নিন্দার সুযোগ পেয়ে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসকারী থমাস ম্যাকাওলের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে প্রমাণ করছে এক শ্রেণীর মানুষ, সেই শ্লোকটি রয়েছে—ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তে, এরকম—'ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্ বাহু রাজনঃ কৃতঃ। উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যং প্যাং শূদ্রো অজায়ত।।' (ঋক্ বেদ) অর্থাৎ, এই বিরাট পুরুষের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ জন্ম নিলেন, বাহুদ্বয় থেকে ক্ষত্রিয়, উরু দু'টি থেকে বৈশ্য এবং পদযুগল থেকে শূদ্র উৎপন্ন হলেন।

মনুসংহিতা বিশেষজ্ঞ ড. সূর্যকুমার সরকার ও অন্যান্য পণ্ডিতদের মতে এই শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের দুটি কারণ, প্রথমত পরম পুরুষের চারটি অঙ্গ থেকে চতুর্বর্ণের সৃষ্টি, এই ধরনের অনুভব ঋগবেদের অন্যত্র পরিলক্ষিত হয় না। দ্বিতীয়ত ঋগ্‌বেদের মূল ভাষার তুলনায় উক্ত শ্লোকটির ভাষা নিতান্তই সরল এবং তা রামায়ণ, মহাভারতের সংস্কৃত স্বরূপ।

আর যদি ধরেই নিই যে শ্লোকটি মূল বেদেই ছিল, সেই ক্ষেত্রে 'বর্ণব্যবস্থা ও স্বামী প্রণবানন্দ' প্রবন্ধে শাস্ত্রবিদ অধ্যাপক ডঃ সীতানাথ গোস্বামী বলেছেন 'এই বর্ণনা থেকে এমন মনে করা অসঙ্গত হবে যে, মুখজাত ব্রাহ্মণের মর্যাদা সর্বোচ্চ এবং পদজাত শূদ্রের সম্মান সকলের নীচে। বস্তুতঃ পঠন-শ্রবণ-বচন প্রভৃতি কার্যগুলো মুখমণ্ডলের দ্বারাই সম্পন্ন হওয়ায় ব্রাহ্মণকে মুখজাতত্ব বলা হয়েছে। সকলেই জানেন যে ব্রাহ্মণের প্রধান কার্য হল অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা। ক্ষত্রিয়ের রক্ষণকার্য প্রধানতঃ শারীর-শক্তি তথা বাহুবলের দ্বারা সম্পাদিত হওয়ায় ক্ষত্রিয়ের বাহু-জাতত্ব সঙ্গত। বৈশ্যকে বাণিজ্যে লেগে থাকতে হলে বহু দূরদেশ ভ্রমণ করতে হয়। ভ্রমণের জন্য উরুসঞ্চালন বিশেষ আবশ্যক হওয়ায় বৈশ্যকে উরুজাত বলা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। শিল্পোপজীবী শূদ্র রাষ্ট্রসেবাদি কর্মের সম্পাদন করায় সমাজ ও দেশ বিধৃত থাকে, আর তার জন্যই শূদ্রকে পদজাত বলা হয়েছে। পদদ্বয়ের উপরেই মনুষ্যের যেমন অবস্থান হয়, তেমন শূদ্রের উপরেই সমাজের প্রতিষ্ঠা। এই যে

‘সেবা’ কে আমরা সব সময় অবজ্ঞার চোখে দেখি, সেখান থেকেই ভ্রান্তিগুলো বুদবুদের ন্যায় শান্ত শুভ্র জ্ঞানরূপী দুগ্ধকে অজ্ঞানতার তাপে ক্রমাগত বাষ্পীভূত করে যাচ্ছি। ভুলে গেলে চলবে না যে দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত সেই দেশ ‘সেবার’ কাজে নিযুক্ত। আমলা, অফিসার, থেকে শুরু করে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল সব নিজ নিজ ক্ষেত্রে সেই দেশ ও মানব সেবাই করছেন।

বেদের বিভিন্ন শ্লোকে আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন, ‘তে অজ্যেষ্ঠা অকনিষ্ঠাস উদ্ভিদো হমধ্যমাসো মহসা বিবাবৃধুঃ। সুজাতাসো জনুষা পৃশ্নি মাতরো দিবো ম্যা আ নো অচ্ছা জিগাতন।।’ অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে কেউই বড়-ছোট নয় এবং তারা সকলেই উন্নতি সাধন করছে। জন্ম থেকে তারা কুলীন। তারা জন্মভূমির সন্তান ও দিব্য। ‘অজ্যেষ্ঠাসো অকনিষ্ঠাস এতে সংভ্রাতরো বাবৃধুঃ সৌভগায়।।’ অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে কেউ বড় নয় বা কেউ ছোট নয়। এরা ভাই ভাই। সৌভাগ্যলাভের জন্য এরা প্রযত্ন করে। অথর্ববেদের এক জায়গায় বলা হয়েছে—‘উতদেবা অবহিতং দেবা উন্নয়থা পুনঃ। উতাগশ্চক্রুষং দেবা দেবা জীবয়থা পুনঃ।।’ অর্থাৎ, হে বিদ্বানগণ! পতিত জীবকে ঊর্ধ্বে উঠাও, পাপীদের উৎকৃষ্ট জীবন দান কর।

আমাদের রামায়ণেও প্রায় বেদ সমভাবাপন্ন দর্শন দেখা যায়। শূদ্রকে ক্ষুদ্র ভাবা বা শূদ্র বলেই সে অস্পৃশ্য তেমন ধারণা ছিল না। কারণ চণ্ডাল গুহক ছিলেন মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রের মিত্র। শবরী নীচ বংশীয়া হলেও উচ্ছিষ্ট ফল রামচন্দ্রকে সাদরে প্রেম ও ভক্তির দূত স্বরূপ প্রদান করেছিলেন। রামসেতু নির্মাণে আদিবাসী, জনজাতি, বনবাসী, পশু পাখি সবাই দল মত নির্বিশেষে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এখানে বলে রাখা ভালো শম্বুক নামক এক শুদ্রকে যে শ্রীরামচন্দ্র বধ করেছিলেন, সেই বিষয়ে অর্ধ সত্য বলে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে ভারত আত্মাকে অপমান করছে এক শ্রেণীর মানুষ। দুর্বৃত্তরা বলেন যে শাম্বুক শুদ্র ছিল বলে শ্রীরামচন্দ্র তাকে হত্যা করেছিলেন। তাদের জানা উচিত ছিল যে শম্বুক কোন মহৎ উদ্দ্যেশে তপস্যা করছিলেন না, তার লক্ষ্য ছিল হিংসা। কারণ শম্বুককে যখন রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন তপস্যার কারণ? উত্তর আসে দেবলোক বিজয়। তার এই বদ উদ্দেশ্য ও স্বর্গ-মর্ত্যের শান্তি ও রক্ষার জন্য শম্বুক বধ আবশ্যিক ছিল। তাই বধের কোন জাতিগত কারণ ছিল না।

মহাভারতেও বলা হয়েছে যে, সকলের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত যজ্ঞানুষ্ঠানে সকলের অবদান থাকায় সকলেই যজ্ঞের ফল ভোগ করেন। এখানে ব্রাহ্মণ শূদ্রের কোন বিভেদ নেই। যজ্ঞ সকল বর্ণের হওয়ায় সকলেই যজ্ঞের ফল ভোক্তা-‘যতো হি সর্ববর্ণানাং যজ্ঞস্তস্যৈব ভারত।’

ভারত সেবাশ্রম সংঘের তেজস্বী স্বামী বেদানন্দ তাঁর ‘হিন্দুত্বম’ গ্রন্থে বলেছেন এই রকম, ‘প্রচলিত ধারণা যে শূদ্রাদির পক্ষে ‘ওঁ’ উচ্চারণ করা অনুচিত। এ ধারণাও সম্পূর্ণ মিথ্যা। ‘ওঁ’ শব্দব্রহ্ম। ক্ষুদ্র সরিষার ন্যায় বীজ হইতে যেমন বিরাট অশ্বত্থ বৃক্ষের উৎপত্তি, তেমনি—‘ওঁ’ শব্দ হইতে যাবতীয় শব্দের উৎপত্তি।.... তাই ‘ওঁ’ শব্দই ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম। ‘হরিনাম’ বলিতে যেমন কারো বাধা নাই, তেমনি ‘ওঁ’ উচ্চারণ করিতে কারো নিষেধ থাকিতে পারে না।’ তিনি সমবেত ভাবে উপাসনার ব্যাপারে বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, ‘সাধারণ হিন্দুসমাজেও তদ্রূপ সমবেত উপাসনা পদ্ধতি প্রচলিত করিতে হইবে। সমবেত উপাসনার মধ্য দিয়াই সঙ্ঘশক্তি হিন্দুসমাজে ফিরিয়া আসিবে। বৈদিক যুগে ও তৎপরবর্তী যুগেও এই সমবেত উপাসনা পদ্ধতি ছিল বলিয়াই হিন্দুসমাজে সংহতি ছিল।’

বহু বিতর্কিত মনু সংহিতাতেও দেখতে পায় যে ‘শুদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শুদ্রতাম ঊক্ষত্রিয়জ যতমেবং তু বিদ্যাদ বৈশ্যত তথৈব চ’—কালক্রমে ব্রাহ্মণ শুদ্রত্ব প্রাপ্তি ঘটে অথবা শূদ্রেরও ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। বড়ো হৃদয় নিয়ে যদি আমরা মনুর শ্লোকগুলোকে বিশ্লেষণ করি, তাহলে চতুবর্ণ যে কর্ম ভিত্তিক সেটাই অনুধাবণ করা যায়। অন্য কোন আলোচনাই শুধু মনুসংহিতা নিয়ে অধ্যয়ন করা যাবে।

উপরে উল্লেখিত নানা ভাবে নানা উপায়ে বেদের সাম্যের গান গাইলেও বহু বছরের ধর্ম বিমুখতা মানুষের মাঝখানে অজ্ঞানতার পাঁচিল গেঁথে বসে আছে। তাই তো নারায়ণ ‘তুমি যুগে যুগে দূত, পাঠায়েছ বারে বারে, দয়াহীন সংসারে।’

বীর সিংহ চৈতন্যদেব উচ্চ স্বরে বললেন, ‘চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি পরায়ণঃ’ অর্থাৎ চণ্ডালও যদি হরিভক্তিপরায়ণ হন, তবে তিনি ব্রাহ্মণের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হন। হরিদাস ঠাকুর, জগাই-মাধাই, হুসেন শাহের দুই মন্ত্রী—যাঁরা পরে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামী নামে পরিচিত এঁরা তারই জ্বলন্ত উদাহরণ।

‘শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’তে একাধিক জায়গায়

জাতিভেদ হীন সমাজের কথা বলা হয়েছে। যেমন—

‘নীচ জাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎ কুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য।।
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার।।’

কাশীতে মহাপ্রভু শূদ্রের বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলেন, ‘কাশীতে লেখক শুদ্র চন্দ্রশেখর। তার ঘরে রহিলা প্রভু স্বাতন্ত্র্য ঈশ্বর’ (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)। আবার সুদূর নীলাচলেও, মহাপ্রভু অস্পৃশ্যদের হাতে ধরিয়েছিলেন, জগন্নাথের রথের দড়ি, রাজা প্রতাপরুদ্র ও সকল শ্রেণীর প্রজা একসঙ্গে মিলে রথের দড়ি টানছে, আহা! কি মধুই না সে দৃশ্য। রাজা প্রতাপ রুদ্র যখন প্রথমে মহাপ্রভুর দর্শনে উদগ্রীব তখন তিনি বলেছিলেন—

‘অদর্শনীয়ানপি নীচজাতীন্ সংবীক্ষতে হন্ত তথাপি নো মাম্।

মদেকবর্জ্যং কৃপয়িষ্যতীতি নির্ণীয় কিং সোহবততার দেবঃ।।’

অদর্শনীয় নীচজাতিগণকেও দর্শন দিতেছেন, তথাপি আমাকে দর্শন দিবেন না! আমি বিনা, সকল জীবকে কৃপা করিবেন, ইহাই স্থির করিয়া কি তিনি (শ্রীচৈতন্যদেব) অবতীর্ণ হইয়াছেন? (শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্)

হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে মহাপ্রভু একই প্রেমের পাশে আপামর সর্বস্তরের হিন্দু জাতিগুলোকে একসূত্রে বন্ধন করেছিলেন, ফলে সকল হিন্দুই হল এক। মহাপ্রভুর প্রেমধর্মে সেদিন ঠাঁই পেয়েছিল অহিন্দুরাও, তিন লক্ষ জপকারী হরিদাসের সম্বন্ধে প্রভু বলেছিলেন—

‘প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম নাহিক আমাতে।।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ, তপোদান।।
নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজন্যাসী হতে তুমি পরম পাবন।।’

জাতিনাশের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে তিনি বিধান দিয়েছিলেন যে ‘এক হরিনামে তব পাপদোষ যাবে। অন্য হরিনামে কৃষ্ণ-চরণ পাবে।।’ তৎকালীন পণ্ডিত সমাজের প্রায়শ্চিত্তের জটিল গণিত মহাপ্রভুর বিধানে হয়ে গেল জলবৎ।

চৈতন্য পরবর্তী যুগে স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী প্রণবানন্দ হিন্দু ধর্মে সাম্য ভাব রক্ষা করার জন্য সর্বত্র লড়াই করেছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ অনুভব করেছিলেন যে, সমাজে পিছিয়ে পড়া শূদ্র জাতির পেছনে মূল হেতু হল চরম দারিদ্র্যতা। একইসঙ্গে শিক্ষার অভাবকেই তিনি শূদ্র শোষণের মূল কারণ বলেছেন। তাই সবার আগে দরকার শূদ্রদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার। বিবেকানন্দ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, শূদ্রদের মুক্তি ছাড়া ভারতীয় সমাজের উন্নতি কখনই সম্ভব নয়। তিনি বলেছিলেন ‘আমাদের mission (কার্য) হচ্ছে অনাথ, দরিদ্র, মূর্খ, চাষাভূষোর জন্য; আগে তাদের জন্য করে যদি সময় থাকে তো ভদ্রলোকের জন্য।’ তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল ভারত একদিন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হবে। তিনি দেশের দরিদ্র জনগণের উপর ধনী ব্যক্তিদের প্রাধান্য, নিম্নশ্রেণির উপর উচ্চশ্রেণির প্রভুত্ব একেবারেই সমর্থন করেননি। বিবেকানন্দ জাতিব্যবস্থাকে প্রাকৃতিক নিয়ম ও স্বাভাবিক ব্যবস্থা বললেও জাতিগত অসাম্যকে তিনি কখনই সমর্থন করেননি। তাঁর ভাষায়, ‘জাতি বিভাগ প্রাকৃতিক নিয়ম, সামাজিক জীবনে আমি কোন বিশেষ কর্তব্যসাধন করিতে পারি, তুমি অন্য কাজ করিতে পারো।... এই কার্যবিভাগ স্বাভাবিক। আমি জুতা সেলাই করতে পটু, তুমি বেদপাঠে পটু। তাই বলিয়া তুমি আমার মাথায় পা দিতে পার না, তুমি খুন করিলে প্রশংসা পাইবে আর আমি একটা আম চুরি করিলে ফাঁসি যাইতে হইবে, এরূপ হইতে পারে না। এই অধিকার তারতম্য উঠিয়া যাইবে।... তোমার ভিতর যে ঈশ্বর আছেন, আমার ভিতরও সে ঈশ্বর আছেন। আর ইহাই আমরা চাই কাহারও কোন বিশেষ অধিকার নাই, অথচ প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতি করিবার সমান সুযোগ থাকিবে।’

স্বামীজী ভারতকে বেদান্তের ভিত্তিভূমিতে একটি সার্বভৌম জাতীয় ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। স্বামীজী বলেছিলেন, ‘কে অস্পৃশ্য! এরা নারায়ণ। হোক না দরিদ্র, কি আসে যায়, এরা যদি আলো না পায়, এদের যদি জাগানো না হয়, এদের আপন বলে পাশে স্থান না দেওয়া হয় তাহলে দেশ কোনদিন জাগবে না।’ তিনি দেশের অভ্যন্তরে যে সামাজিক বৈষম্য রয়েছে সেই বৈষম্যকেই যাবতীয় বন্ধনের মূল কারণ বলেছেন। স্বামীজি ছিলেন ভারতপ্রেমী। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, যিনি ভারত দর্শন করেছেন তিনি সমগ্র বিশ্ব দর্শন করেছেন। তাই ভারতবাসীকে স্মরণ করে ‘বর্তমান ভারত’ প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বলেছেন, ‘নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র,

অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল আমি ভারতবাসী, চন্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।'

ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ, নরোত্তম দাস ঠাকুরের কথায়, 'যদি দয়া না করিবে পতিত দেখিয়া, পতিতপাবন নাম কিসের লাগিয়া'—এই মর্মে সকল দিকে পতিত উদ্ধারে ব্রতী হয়েছিলেন। শিব অবতার গুরু মহারাজ' প্রণবানন্দ বলেছেন, 'আমার সঙ্ঘ হবে দ্বিতীয় বুদ্ধের সঙ্ঘ। আমি সমগ্র দেশ ও জাতিকে বুদ্ধ-শঙ্কর-চৈতন্যের মত আদর্শ ও তপঃশক্তিতে সঞ্জীবিত করতে চাই।' কেন গুরুমহারাজ সংঘের উপর এত জোর দিয়েছিলেন? কারণ, একটি উদ্দেশ্যহীন পথভ্রষ্ট জাতিকে এক সূত্রে বাঁধতে হলে চাই সংঘ চেতনা। কারণ কলি যুগে সংঘই শক্তি (সংঘ শক্তি কলৌ যুগে) নইলে হিন্দু ধর্ম সেই সময় মস্ত বড় খাদের সম্মুখীন হত। গুরু মহারাজ বললেন, 'আমি হিন্দুকে হিন্দু বলে ডাক দিতে চাই। আমি সমগ্র হিন্দু জনসাধারণকে 'আমি হিন্দু, আমি হিন্দু, আমি হিন্দু' জপ করাব।'

দলিত উদ্ধারে গুরুমহারাজ কতখানি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন, সে-প্রসঙ্গেও স্বামী বেদানন্দজী বলেছেন, '....সঙ্ঘনেতা আচার্য্যদেবের মধ্যে ভগবৎ-করুণা ও আশীর্বাদধারা উদ্বেলিত। তিনি সেই করুণা ও আশীর্বাদ ধারা ঢালিয়া দিবার জন্য ব্যাকুল। হাজার বছর ধরিয়া যাহারা পতিত, দলিত, ঘৃণিত, উপেক্ষিত, যাহাদের দেখিবার কেউ নেই, সান্ত্বনার বাণী শোনাবার কেউ নেই, দুঃখে, বিপদে সহানুভূতি কেউ করে না, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া পশুর মতো জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইয়াছে যাহারা, তাহাদের কোলে নিবার জন্য, আশ্বাসের বাণী শুনাইয়া, আশীর্বাদ ধারায় অভিনিষিক্ত করিবার জন্য আচার্য্যদেব উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। শরীরবোধ যেন তিরোহিত হইল। সকলের সনির্বন্ধ ও সকাতর প্রার্থনাতেও তিনি জীর্ণ স্বাস্থ্যের দিকে চাহিয়াও একটি দিনও অপেক্ষা করিলেন না। সে ব্যস্ততা, ব্যাকুলতা না প্রত্যক্ষ করিলে ধারণা হয় না।'

সর্ব স্তরের মানুষদের আধ্যাত্মিক মিলনের জন্য তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, 'হিন্দু মিলন মন্দির'। তিনি বলেছিলেন, 'আমরা রচনা করবো—একটা মিলন-ক্ষেত্র, যেখানে সর্বশ্রেণীর হিন্দু একত্র সম্মিলিত হবে।' এতদিন যারা সমাজে পতিত, দলিত, অবহেলিত ছিল, এখন তারা আর সে-ভাবে না থেকে তারাও হিন্দুর মূল সমাজের লোক বলেই পরিচিত হতে থাকল। উঁচু-নীচু, শিক্ষিত-মূর্খ, ধনী-নির্ধন সব পরিচয় দূরে সরিয়ে একমাত্র পরিচয় হল 'হিন্দু'। গুরুমহারাজ বলতেন 'হিন্দু কখনো হিন্দুর নিকট অস্পৃশ্য হতে পারে না। অনাচরণীয় হতে পারে না। শাস্ত্রপ্রণেতা আচার্য্য ঋষিগণ কদাচ একথা স্বীকার করেননি, তা তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় জীবন ও আচরণে প্রকাশ। মধ্যযুগের ধর্মবিপ্লব, সমাজ বিপ্লব ও রাষ্ট্র বিপ্লবের ফলে লোকাচার, দেশাচার, স্ত্রী আচারের গোলোক-ধাঁধায় পড়ে শাস্ত্র সদাচার ভুলে আত্মবিস্মৃত হিন্দু জনসাধারণ এই কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধরে আছে। হিন্দু-সমাজের এই অনাচরণীয়তা ও অস্পৃশ্যতার গ্লানিকে মুছে ফেলতে হবে।'

আরো অনেক জাতি সংস্কারক এগিয়ে এসেছিলেন, হিন্দুদের মূল বৈদিক ভাবনা প্রতিস্থাপনের জন্য। কিন্তু নিবন্ধ ভারাক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় আর এখানে যুক্ত করতে পারলাম না, তাই দুর থেকে তাঁদের সকলের উদ্দেশ্যে নিবন্ধকার প্রণাম জানাই, সর্বশেষে এটাই বলতে চাই, সেই রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'যে দুর্বল সেই প্রবলকে প্রলুব্ধ করে পাপের পথে টেনে আনে। পাপের প্রধান আশ্রয় দুর্বলের মধ্যে। .....আপনার জন্যেও, প্রতিবেশীর জন্যেও আমাদের নিজেদের দুর্বলতা দূর করতে হবে।' তবেই হবে এ যুগের নবজাগরণ। ■

পরিষদ বার্তা

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, মধ্যবঙ্গ প্রান্তে সেবা বিভাগের উদ্যোগে ১০টি ঝোলা পুস্তকালয়

তারকেশ্বর জেলা, আরামবাগ প্রখন্ড মোট ১০টি ঝোলা পুস্তকালয় স্থাপিত হয়েছে। এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে জ্ঞানচর্চা, সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রসারে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন ক্ষেত্র প্রমুখ শ্রীসুধাংশু কুমার পাত্র মহাশয় এবং প্রান্ত সেবা বিভাগের সদস্য শ্রী শুভাশিষ মল্লিক মহাশয়।

শুধুমাত্র হিন্দু আস্থার উপরই কেন আঘাত হানা হয়?

ড. জয়ন্ত বিশ্বাস

কংগ্রেস পার্টির সরকার ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে 'পূজা স্থল' আইন নামক একটি নতন আইন প্রণয়ন করিয়েছিল, যাতে বলা হয়েছে ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে যে সমস্ত পূজা বা উপাসনা স্থলের যা স্বরূপ ছিল, তার কোন পরিবর্তন করা চলবে না। এমনকি এই বিষয়ে আদালতেও চ্যালেঞ্জ করাও যাবে না। যার বাস্তবিক অর্থ হল ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ পর্যন্ত, যে সমস্ত হিন্দু মন্দির ভেঙে অন্য কোন ধর্মের পূজা বা উপাসনা স্থল বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে কোন হিন্দু সমাজ বিরোধ জানানোর জন্য আদালতে যেতে পারবে না। স্বাভাবিক রূপে এটি ন্যায়ের মূল ভাবনার প্রকৃত সিদ্ধান্তের বিপরীতধর্মী বলে মনে করা হচ্ছে। যখন আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল, তখন বলা হয়েছিল সাম্প্রদায়িক সৌহাদ্র বজায় রাখার জন্য এই আইন করা হয়েছে। এই আইনের প্রণয়নের আগে যে সমস্ত মামলা বিচারাধীন, সেইগুলোকে এর আওতার বাইরে রাখা হয়েছিল। প্রশ্ন হচ্ছে যদি কেউ পুরোন পূজা স্থলকে ভেঙে তার উপরে যে (ইমারত) বর্তমান পূজাস্থল বানানোর তথ্য প্রমাণ দেয়, যে ক্ষেত্রে কেউ কোন আদালতে যাবে না? যেখানে হিন্দুসমাজ পুরাতন প্রমাণ ও তথ্যের আধারে নিজের মন্দির পুনরায় বানানোর আবেদন জানাচ্ছে, তখন কেন বিরোধী পক্ষ এই আইনের অজুহাতে হিন্দুদের আবেদনকে রুখবার প্রয়াস করেছে, ভাবা দরকার। শুধু সম্প্রদায়িক সৌহাদ্যের আড়ালে সংখ্যা বহুল সমাজকে প্রতারিত করা এবং ন্যায়ের প্রাকৃতিক সিদ্ধান্তকে বলি দেওয়া কি উচিত?

কেরালার শবরীমালা মন্দিরে এক বিশেষ বয়সের মহিলাদের মন্দিরে প্রবেশের অনুমতির প্রশ্নে একটি মামলা গত ২২ বছর ধরে চলে আসছে। শবরীমালা মন্দিরে ভগবান আয়াপ্পাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী মানা হয়। এই কারণে ওই মন্দিরে কেবলমাত্র ১০ থেকে ৫০ বছরের মহিলাদের প্রবেশ নিষেধের পরম্পরা বহুকাল ধরে চলে আসছে। ১৯৯০-এর দশকে কিছু কিছু মানুষ (যাদের হিন্দু ধর্মের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই) কেরালা হাইকোর্ট আবেদন দাখিল করেছিল। কিন্তু মহামান্য কোর্ট দক্ষিণ ভারতের শ্রদ্ধালুদের আস্থার পক্ষে তার রায় দান করেন। সব পক্ষ সেই রায়কে মেনে নিয়েছিল। তার ১৫ বছর পর ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে ইন্ডিয়ান ইয়াং লয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে, সব মহিলাদের প্রবেশ অবাধ করার জন্য প্রশ্ন তোলে। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে, সব মহিলাদের মন্দিরে প্রবেশ করতে দিতে হবে। মন্দির ট্রাস্ট বলেছিল, ভগবান আয়াপ্পার দেশজুড়ে ১০০০টি মন্দির আছে। কেবলমাত্র এই মন্দিরে দেবতাকে ব্রহ্মচারী রূপে পূজা করা হয়। তাই বাকি ৯৯৯টি মন্দিরে গিয়ে পুজো দেওয়া যেতে পারে। বাস্তবে মহিলাদের প্রবেশের অনুমতির আড়ালে কেবলমাত্র হিন্দু আস্থাকেই আঘাত দিতে চাইছে পরিকল্পিত যোজনার মাধ্যমে। আইন এবং ধর্মের নিজের নিজের পরিধি আছে সেটা ভাবা দরকার। একে অপরের সীমানা অতিক্রম না করাই উচিত বলে জ্ঞানী জনেরা বলে থাকেন। যেখানে সংবিধান সমতার অধিকার দেয়, সেখানেই প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজে নিজের ধর্ম পালন করার অধিকারও দিয়েছে। সুতরাং উপাসনার নিয়ম বানানোর অধিকার সেই সমাজের থাকা উচিত।

রাখিবন্ধন ভাই-বোনদের পবিত্র স্নেহ ও বিশ্বাসের সংস্কার যা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। কিন্তু সম্প্রতি গহনা প্রস্তুতকারক একটি কোম্পানি ফিল্ম অভিনেত্রী কীর্তি মেননকে অশালীন বস্ত্র পরে ভাইকে রাখি বাঁধছে এবং সঙ্গে একটি কুকুর শাবককেও রাখি পরাচ্ছে, এই রকম একটি শর্ট ফিল্মের মাধ্যমে পবিত্র রাখি বন্ধনকে কলুষিত করেছে। সনাতনী পরম্পরাকে আঘাত দেওয়ার জন্য অশালীন বস্ত্র এবং কুকুর শাবককে রাখি পরানোর মতো সাহস কিভাবে পেয়েছে তা ভাবা দরকার। এটি কোন প্রথম ঘটনা নয়, এর আগেও একটি গয়না প্রস্তুতকারক কোম্পানি একত্ব অভিযানের আড়ালে সরাসরি লাভ জিহাদকে প্রমোট করেছিল। ওই ফিল্মে একটি হিন্দু যুবতীকে মুসলমান পরিবারের বউ দেখিয়ে গর্ভধারণের জন্য অনুষ্ঠানের নাটক দেখানো হয়েছিল। তীব্র প্রতিবাদের ফলে কোম্পানি ভুল স্বীকার করে সেই ফিল্মটি তুলে নেয়। ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ফেব ইন্ডিয়া, দীপাবলিকে 'জশনে

রিওয়াজ’ বানিয়ে অভিযান চালিয়েছিল। যদিও তখন বিরোধ হওয়ায় কোম্পানি সেই বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করে নেয়। ওই বছরই কলকাতার একটি কোম্পানি মঙ্গলসূত্র অভিযানে পারম্পরিক হিন্দু বৈবাহিক প্রতীককে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ এবং উত্তেজক ছবির সঙ্গে প্রস্তুত করেছিল। এক্ষেত্রেও ব্যাপক বিরোধের পর সেই বিজ্ঞাপন ফেরত নেওয়া হয়েছিল। ফেম নামক কোম্পানি করওয়া চৌথ পালনের পারম্পরিক উৎসবকে অত্যন্ত নোংরা ভাবে প্রস্তুত করেছিল। সেই বিজ্ঞাপনের বিরোধ হওয়ায় তা ফেরত নেয় সেই প্রতিষ্ঠান। এরকম আরো অনেক ঘটনার বিবরণ আছে, কিন্তু ভাবা দরকার সেইসবই কি মাত্র একটি ভুল? নাকি এর পিছনে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছিল? কোন একটা ঘটনাকে ভুল ভাবা যেতে পারে, কিন্তু বারংবার একই ভুল কি হতে পারে? বাস্তবে এর পেছনে একমাত্র অভিপ্রায় হচ্ছে, সনাতনীদের আস্থার উপর আঘাত আনা। হিন্দুদের সহিষ্ণুতাকে ব্যবহার করে কেবলমাত্র ক্ষমা চেয়ে নিয়ে, আর বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করে পার পেয়ে যাচ্ছে ওইসব ষড়যন্ত্রকারীরা। যতদিন বিজ্ঞাপন চলেছে, ততদিনে তারা প্রচারের মাইলেজ পেয়ে যাচ্ছে এইটি তাদের অভিপ্রায় মাত্র। হিন্দু উৎসবগুলোতে তাদের উৎপাদন বিক্রি করাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু হিন্দুদের সাংস্কৃতিক মর্যাদা এবং সম্মানকে আঘাত করার সাহস তারা পায় কিভাবে? এই দুঃসাহসের জন্য সই সমস্ত ব্যক্তি, কোম্পানি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিবাদ জানানো দরকার। এই ধরনের কৃতকারীদের উৎপাদন, ফিল্ম কেনা এবং দেখাকে বয়কট করা দরকার। এখন কেবলমাত্র বিজ্ঞাপন সরিয়ে নিলেই চলবে না, এর দায়ভার তাদের নিতেই হবে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ধারা ২৯৯ অনুসারে ধার্মিক ভাবনাকে জেনে শুনে এবং দুর্ভাবনা পূর্বক পদ্ধতিতে আহত করার উদ্দেশ্যে শব্দ, সংকেত এবং দৃশ্য প্রস্তুতি কিংবা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ধর্ম কিংবা ধার্মিক বিশ্বাসকে অপমান করাকে অপরাধমূলক কাজ বলা হয়েছে। এর জন্য তিন বছরের কারাবাস এবং আর্থিক দণ্ড—দুইই দেওয়ার বিধান আছে। হিন্দু সমাজকে সজাগ থাকতে হবে, যাতে কেউ যেন সনাতনীদের আস্থাকে আঘাত দিতে সাহস না পায়।

বাস্তবে যাঁরা এইসব অপরাধ করে থাকেন, তাঁরা খুব ভালো করে জানেন যে, এই অপমানসূচক কাজ অন্য কোন ধর্মাবলম্বীদের উপর করলে তারা বিপদে পড়তে পারেন। কিন্তু সনাতন ধর্মের মানুষ সংগঠিত নয় কিংবা অতি সেক্যুলারবাদী, তাই ওরা এসব বিকৃত তথ্যকে আমলই দেবেন না। সেই কারণে তারা শুধুমাত্র হিন্দু আস্থার উপর আঘাত হেনে অন্যদের তোষণ করতে চান। বর্তমান সময়ে হিন্দুদের মধ্যে স্বধর্মের প্রতি আগ্রহ, নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা, প্রেম জাগরিত হচ্ছে, তাই আর সনাতনীরা এইসব মেনে নেবেন না। প্রতিবাদ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং আদালতের আশ্রয় নিচ্ছে হিন্দু সমাজ।

পরিষদ বার্তা

★২২ এবং ২৩ আগস্ট আলিপুরদুয়ার জেলায় অনুষ্ঠিত হল জেলা কার্যকর্তা অভ্যাস বর্গ। মোট ৪৮ জন কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন। সাত প্রখণ্ডের উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্ষেত্র সামাজিক সমরসতা প্রমুখ মাননীয় শ্রীগৌতম কুমার সরকার এবং উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যকরী সভাপতি শ্রীউদয় শঙ্কর সরকার। উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সংগঠনমন্ত্রী মাননীয় অনুপকুমার মণ্ডল অনুষ্ঠানের দ্বীপ প্রজনন করেন কার্যকারী সভাপতি, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত এবং দুদিন ব্যাপী এই বর্গে উৎসাহপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে আগামী স্থাপনা দিবস। অনুষ্ঠান যাতে আরো সুন্দরভাবে করা যায় তার সংকল্প নিয়ে কার্যকর্তারা ফিরে যায়।

★ গত ৯/৮/২০২৬ তারিখে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, উত্তর কলকাতা জেলার আরিয়াদহ-দক্ষিণেশ্বর প্রখণ্ডে শ্রীবিশুদ্ধানন্দ আশ্রমে ‘অখণ্ড ভারত সংকল্প দিবস’ পালিত হল। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সৎসঙ্গ প্রমুখ শ্রীপীতারুণ মুখোপাধ্যায়, উত্তর বিভাগের সম্পাদক শ্রীঅরিন্দম কর, উত্তর কলকাতা জেলা সম্পাদক শ্রীঅভিজিৎ চৌধুরী, সহ-সভাপতি শ্রীমহাদেব পণ্ডিত, উত্তর কলকাতা জেলার সহ-সম্পাদক কার্তিক শাসমল, আরিয়াদহ দক্ষিণেশ্বর প্রখণ্ড পালক সুমিত দাস এবং প্রখণ্ডের মাতৃশক্তি, দুর্গাবাহিনী এবং বজরং দলের সদস্যরা।

★ নদীয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের হাঁসখালি প্রখণ্ডের, রামনগর-২ খণ্ডস্থিত মালশাদহ উপখণ্ডে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ-বজরঙ্গ দলের স্থানীয় কার্যকর্তাদের উদ্যোগে সম্মিলিতভাবে অখণ্ড ভারত দিবসের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল। উক্ত অনুষ্ঠানে অখণ্ড ভারত দিবসের মাহাত্ম্য, ভারত মায়ের হারানো গৌরবকে ফিরিয়ে আনতে বজরঙ্গীদের এবং পরিষদের কার্যকর্তাসহ সাধারণ হিন্দু সমাজের কর্তা ব্যক্তিদের করণীয় সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা হয়। এর পাশাপাশি নেশা মুক্তি দিবস উপলক্ষে হিন্দু যুবসমাজকে নেশার করাল গ্রাস থেকে উদ্ধারের জন্য বজরঙ্গদলের করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়।

★ দাঁতন ২নং প্রখণ্ডের ৩নং খণ্ডের শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রাম থেকে আমাদের বজরঙ্গ দল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, এবং দুর্গা বাহিনীর মিলিত ভাবে বন্যা ত্রাণের জন্য কিছু অসহায় ও দরিদ্র মানুষের হাতে সামান্য খাদ্য সামগ্রী তুলে দিয়েছেন।

★ বিশ্ব হিন্দু পরিষদ খড়্গপুরের কার্যকর্তারা চিড়া, মুড়ি, গুড়, বিস্কুট, চানাচুর কলা ইত্যাদি ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে মেদিনীপুর জেলার সবং-এর বেশ কয়েকটি গ্রামে যায় ও বন্যা পীড়িতদের মধ্যে সামগ্রী বিতরণ করেন। সবং-এর স্থানীয় কার্যকর্তারা সহযোগিতা করেন। খড়্গপুরের ১১ জন কার্যকর্তা সেবাকাজে অংশগ্রহণ করেন।

রাষ্ট্রবাদী রাজ্য সরকারের মাতৃভাষা-প্রেম ও কিংকর্তব্য

ড. শ্যামলচন্দ্র দাস

ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। সদিচ্ছা থাকলে অসম্ভবও সম্ভব হয়। এতকাল যে আইনকে লাগু করার জন্য নিছক দায়সারা প্রয়াস থাকলেও কার্যকরী হয়নি, তা ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে সফল ভাবে কার্যকর হতেই পারে। যেমনটা প্রাচীন ভারতের মৌর্য সম্রাট মহামতি অশোক খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে আইন করে বা রাজ আদেশ জারি করে ব্রাহ্মী লিপি ও প্রাকৃত ভাষাকে সাম্রাজ্যের নানা প্রান্তে শাসনকার্য ও নীতি প্রচারে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, বিশ শতকের প্রথমার্ধে আধুনিক তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা শাসক মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের প্রচেষ্টায় নতুন তুর্কি ভাষা লাগু হয়েছিল।

আতাতুর্কের ভাষাগত উদ্যোগের কথা সংক্ষেপে বলা যাক তাহলে। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে আরবি হরফ বাদ দিয়ে ল্যাতিন বর্ণমালার ভিত্তিতে নতুন তুর্কি বর্ণমালা চালু করেন তিনি। এ ছাড়া ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে তুর্কি ভাষা সমিতি গঠন করে উক্ত ভাষা থেকে আরবি ও ফার্সি শব্দ ঝেড়ে ফেলে তুর্কি ভাষাকে আধুনিকীকরণ ও সহজ-সরল করতে সচেষ্ট হন। করেন ফলপ্রসূও।

পশ্চিমবঙ্গেও তেমনই এক রাষ্ট্রবাদ ও আঞ্চলিক ভাষা-সংস্কৃতির সমন্বয়কারী রাজ্য সরকারের আবির্ভাব ঘটেছে, যাদের সৎ প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষা সরকারিভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যকরী হবে ১লা সেপ্টেম্বর, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে। যেহেতু কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার জানে এবং মানে যে, মাতৃদুগ্ধসম মাতৃভাষা মানুষের আত্ম-পরিচয়ের সবচেয়ে বড় মাধ্যম, মনের গভীরের আবেগ ও অনুভূতি, ধ্যান-ধারণা, মননাদি প্রকাশের শ্রেষ্ঠ উপায়, এর চর্চা জাতিগত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকেও বাঁচিয়ে রাখে ইত্যাদি। অতএব কেন্দ্রীয় সরকারের অনুপ্রেরণায়, রাজ্য সরকার কিভাবে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ভাষা বাংলাকে সুগঠিত ও ঐক্য-রূপ বিধান করে নানাবিধ সরকারি কাজে লাগাতে পারেন, সেটাই uh এখন দেখার [এটাও দেখার যে পশ্চিমবঙ্গের একেবারে উত্তরাংশ এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অন্য ভাষা সহ হিন্দি গুরুত্ব পায় কিনা, পেলে কিভাবে পায়...!]

কেন মাতৃভাষা বাংলার ঐক্য-রূপের কথা বলছি? তার কারণ হল এখন আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব সমগ্র শিক্ষিত বাঙালি জাতির মধ্যে বজায় নেই, বরং একাধিক প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়ে গেছে। যেহেতু দেশভাগের পর বাঙালি জাতির ইতিহাস-ভূগোল-সংস্কৃতি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে মারাত্মক ভাবে, সেজন্য মাতৃভাষা বাংলার বানান নির্ভর ভিত হয়ে গেছে বিচিত্র চেহারার, শৃঙ্খলাহীনও। গড়ে উঠেছে বাংলাদেশে বাংলা একাডেমি, পশ্চিমবঙ্গে বাংলা আকাদেমি। ইতিমধ্যে মাথা চাড়া দিয়েছে আনন্দবাজার পত্রিকার বানান বিধি। এমনকি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো বানান বিধি অথবা সংসদ বাংলা অভিধানের আদর্শও অনেক সময় গৃহীত হয়েছে। সংসদের প্রবর্তিত বানান ও পরিভাষা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের পরিভাষা সর্জন-পদ্ধতিও অনেক ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে স্বতন্ত্রভাবে। ফলে অষ্টাদশ শতক থেকে আজ পর্যন্ত লক্ষ করলে দেখা যাবে, বাঙ্গালা বাঙ্গলা, বাঙলা, বাংলা (অথবা কলিকাতা, কলকাতা, কোলকাতা, Calcutta, Kolkata) ইত্যাদির মতো বানান ও বৈচিত্র্যপূর্ণ পারিভাষিক শব্দ বাংলা ভাষা-সংস্কৃতির জগতে চালু হয়ে রয়ে গেছে। সবগুলোই আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন। কারণ আধুনিক যুগের বাংলা ভাষাচর্চার ইতিহাস ও অতীত ঐতিহ্য লক্ষ করলে দেখা যায়, ওই তিন-চার ধরনের স্বতন্ত্র বানান বিধি লাগু রয়েছে। অতীত ঐতিহ্য বাদ দিয়ে তো বর্তমানকে সুগঠিত করা যায় না! এজন্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার-প্রসার ও সুগঠিত করার উদ্দেশ্যে যখন বিভিন্ন সংস্থা তৈরি হয়েছিল, সেগুলির কালগত পরম্পরা, সাদৃশ্য, অমিল ইত্যাদি আমাদের জানা আবশ্যক।

যেমন প্রথম বাংলা ভাষা সাহিত্যের প্রচারের জন্য 'বেঙ্গল একাডেমি অফ লিটারেচার' ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে বিনয়কৃষ্ণদেবের সভাপতিত্বে তৈরি হয়। পরেই এই সংস্থাটি পুনর্গঠিত হয় ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' নামে, যার প্রথম সভাপতি ছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত। এই সংস্থা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের উদ্যোগ ও নেতৃত্বে বাংলা

ভাষার বানান, পরিভাষা ইত্যাদি বিষয়ে একাধিক কাজকর্ম সংঘঠিত করেছিল (আজও এই সংস্থা সচল রয়েছে)। পরে ১৯৩০-এর দিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বাংলা বানানের নিয়ম নির্মাণের জন্য রবীন্দ্রনাথ অনুরোধ করেন। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একটি কমিটি গঠন করেন এবং ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে প্রামাণ্য নিয়ম লাগু করা হয় বাংলা বানানের জন্য। পরে রবীন্দ্রনাথ, পরশুরাম প্রমুখ এই বাংলা বানান সংশোধন করার প্রয়াস করেন। এই বানান বিধি পরবর্তী সময়ে প্রায় ৭০ বছর পর্যন্ত প্রচলিত ছিল অনেক ক্ষেত্রে।

যদিও ইতিমধ্যে আনন্দবাজার পত্রিকা (১৯২২) তাদের নিজস্ব বানান বিধি লাগু করে, বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রচেষ্টায় ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ থেকে। এই পত্রিকার নিজস্ব প্রয়োগ-বিধি নিয়ে 'বাংলা : কি লিখবেন, কেন লিখবেন' নামে একটি পূর্ণাঙ্গ বিধি-গ্রন্থ বা গাইডলাইন তৈরি ও প্রকাশ করেন শ্রী চক্রবর্তী, যাকে মান্যতা দিয়ে আজকেও এই পত্রিকা তাদের নিজস্ব বানান, পরিভাষা প্রয়োগ ইত্যাদি কাজকর্ম বজায় রেখেছে।

অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা একাডেমি তাদের বাংলা ভাষা বিষয়ে নিয়ম-বিধি চালু করেছিল ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে। যেহেতু এটি তখনও রাষ্ট্রভাষা ছিল না (ছিল উর্দু), সেজন্য তখন এদের আন্তরিক উদ্যোগ ভাষাকে সুগঠিত করবার জন্য প্রযুক্ত হয়েছিল, এমনটা বলা যায় না। বরং ১৯৭১-এর পর বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা হলে বাংলা ভাষার অভ্যন্তরীণ গঠন নিয়ে বেশি করে আন্তরিক ভাবনা-চিন্তা করা হয়েছিল। তবে বাংলাদেশের ভাষায় রয়েছে আরবি, ফারসি, উর্দু ইত্যাদি শব্দের প্রভাব, যাকে স্বাধীনতার প্রাক্পর্বে নাম দেওয়া হয়েছিল 'মুসলমানী বাংলা'। সেই প্রবণতা এখনও সচল রয়েছে। যাইহোক, এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে মুহঃ শহীদুল্লাহ-এর নেতৃত্বে প্রচুর সংখ্যক ভাষার তথ্য সংগ্রাহক ও গবেষকদের উদ্যোগে তৈরি হয়েছিল 'আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' ইত্যাদি। ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মোট ৩ খণ্ডে এই অভিধান প্রকাশিত হয়।

ভারতীয় অঙ্গরাজ্যের প্রকাশন সংস্থা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ (১৯৭০) উচ্চশিক্ষা ও পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে মাতৃভাষার প্রসার এবং পরিভাষা তৈরির মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ ও গতিশীল করার দীর্ঘমেয়াদি চিন্তা-ভাবনা ও কাজকর্ম চালিয়ে আসছে।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে ছাত্রছাত্রীদের জন্য সহজলভ্য ও মানসম্মত বাংলা বই প্রকাশ এই সংস্থার মূল কাজ হলেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে অন্য ভাষার জটিল জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পাঠ্য বিষয়কে বাংলা ভাষায় রূপান্তর করে তা সাধারণের বোধগম্য করাও এর কাজ। তাই বিভিন্ন বিদ্যা বা শাস্ত্রের জন্য নিখুঁত ও আধুনিক বাংলা পরিভাষা তৈরি এরা করেছে এবং আজও করছে। এভাবে সর্বস্তরের শিক্ষায় বাংলা ভাষাকে আরও সুগভীরভাবে যুক্ত করার কাজ এদের উদ্যোগে চলছে।

মুশকিল হল পশ্চিমবঙ্গে যে ধরনের বানান বিধি, পরিভাষা প্রণয়ন ইত্যাদি একদা লাগু হয়েছিল তাতে মিশে গেছিল রাজনীতির প্রত্যক্ষ আংশিক প্রভাব। ফলে বানানের রাজনীতি বা রাজনীতির বানান প্রক্ষিপ্ত হওয়ায় বাংলা ভাষার বানান পরিকল্পনা ও সংস্কার নিরপেক্ষ, যুক্তিনিষ্ঠ, বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা পায়নি, তা নিয়ে নানা তর্ক-বিতর্ক চলতে শুরু করে। পুরুষ-কে বানানো হয় পক্ষ, বাংলা যুক্তাক্ষর-কে ভেঙে সরলীকরণ করার ব্যবস্থা করা হয় (যদিও ক্ষ, জ্ঞ ইত্যাদি ভাঙা যায়নি)। সমাসের বেশ কিছু পরিভাষা তুলে দেওয়া হয়, সম্প্রদান কারক নিয়ে নানা বিতর্ক উত্থাপিত হয়, সংস্কৃত ভাষা নির্ভর কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় হয়ে পড়ে গুরুত্বহীন (বর্তমানে অবশ্য স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ, ক্লীব লিঙ্গ ও উভয় লিঙ্গ সহ তৃতীয় লিঙ্গের আবির্ভাব ঘটেছে!), এমন অনেক কাণ্ড-কারখানা বাংলা ব্যাকরণ নিয়ে তৈরি করা হয়। কিন্তু ইতিপূর্বে মুদ্রিত বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের রচনাবলী পড়তে গেলে শিক্ষার্থী হোঁচট খাবে কিনা, সে কথাও ভাবা হয়নি। অথচ মদনমোহন তর্কালঙ্কার, বিদ্যাসাগর প্রমুখের বর্ণমালার সংস্কার নিয়ে ভাবা হল, ভাবা হল পুরোনো বানানের সরলীকরণ নিয়ে।

বাংলা বর্ণমালা ও বানান নিয়ে প্রথম দিকের চিন্তক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা বর্ণমালার শৃঙ্খলাবদ্ধ করে সংস্কার ও গদ্যকে সুনির্দিষ্ট রূপ দিয়ে আধুনিক বাংলার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, যার সংস্কার বিশ শতকের শেষ দিকে হয় পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির উদ্যোগে করা হয় প্রশাসনের এবং অংশত রাজনীতির কারণে। যদিও তা সার্বিকভাবে বিজ্ঞানসম্মত, যুক্তিনিষ্ঠ, ঐতিহ্যবাহী ছিল না।

সেজন্য পর্যালোচনার শেষে বাংলা ভাষার ঐক্য-রূপ তৈরি ও বাস্তব জগতে প্রয়োগ নিয়ে যেভাবে সরকারের ভাবনা-চিন্তা করা উচিত বলে আমাদের মনে হয়, সেগুলোর নিম্নে এভাবে উপস্থাপন করা যায় :

বাংলা ভাষার অবয়ব পরিকল্পনা ও সংস্কারের জন্য প্রত্যক্ষ রাজনীতির যোগ থাকা বিধেয় নয়, বরং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত বাঙালি বিদ্বজনদের নিয়ে আলাপ-আলোচনা, পর্যালোচনা করে নিরপেক্ষ, বিজ্ঞানসম্মত, যুক্তিনিষ্ঠ, ঐতিহ্যবাহী ভিত্তিতে বাংলা ভাষার অভ্যন্তরীণ গঠন নির্মাণ করা বিধেয়। ভাষার ভেতরটা নীরোগ হলে বাইরের লাবণ্য স্বাভাবিকভাবেই ফুটে উঠবে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এখন ধ্রুপদী মানে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে (এই অধমের একটি প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য : 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য : ধ্রুপদী মানের উপাদান প্রসঙ্গে', কালি ও কলম, বাংলাদেশ, নভেম্বর, ২০২৩)। তার একটা দীর্ঘ অতীত ঐতিহ্য রয়েছে। সেই ঐতিহ্য যতটা সম্ভব বজায় রেখে বাংলা লিপি, বানান, পরিভাষা সংস্কার যেমন করা যেতে পারে, তেমনি অভিধান ও শব্দকোষ সাম্প্রতিককালের ব্যবহারের প্রেক্ষিতে সংকলন করা যেতে পারে। অনেকটা 'চলন্তিকা'-র আঙ্গিকে।

যেহেতু ইতিপূর্বে ভারত সরকারের উদ্যোগে নতুন দিল্লিতে সাহিত্য অকাদেমি (১৯৫৪) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার সাহিত্যকর্মের বিকাশ, সমন্বয় এবং দেশের সাংস্কৃতিক ঐক্য বজায় রাখতে, সেজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবশ্য মান্য, তথা কর্তব্য হওয়া দরকার যে, ভারতীয় প্রধান প্রধান ভাষার (২২টি সরকারি ভাষাও হতে পারে) মধ্যে যে যে শব্দে সাম্য বা মিল রয়েছে সেগুলোকে পারিভাষিক শব্দ হিসেবে কতটা গ্রহণ করা যায়, তা বিবেচ্য হতে পারে। তাহলে সেক্ষেত্রে দেশের ভাষাগুলোর শব্দজ ঐক্য যেমন প্রতিষ্ঠা পাবে, তেমনি ভাষাগুলো সম্পর্কেও বাংলা ভাষী শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক জ্ঞানও তৈরি হবে। ফলে বাঙালির সাংস্কৃতিক স্তরে যেমন জাতীয়তার সম্প্রসারণ হবে, তেমনি অন্য ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি সহনশীলতাও বৃদ্ধি পাবে।

তবে প্রধান প্রধান ভারতীয় জীবন্ত ভাষার ভিত্তি যেহেতু সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যকে নির্ভর করে তৈরি হয়েছে, সেজন্য বানান, পরিভাষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সংস্কৃতের নিয়ম-বিধি কিছুটা হলেও অনুসরণ করা বিধেয়। বিশেষ করে, পরিভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে যদি সংস্কৃত ভাষা-ভাণ্ডার থেকে শব্দ সংগ্রহ করে তা নির্মাণ করা যায়, তাহলে তাই হবে প্রকৃষ্টতর পন্থা। আর তা না হলে অন্যান্য ভারতীয় ভাষাকে অবলম্বন করে পরিভাষা নির্মাণ করা যেতে পারে। আর তাও যদি না হয়, তাহলে দেশী তথা অনার্য ভাষাকে, অথবা জনপ্রিয় বাজার চলতি শব্দকে আশ্রয় করেও পরিভাষা নির্মাণ করা উচিত। কেননা ভারতীয় ভাষা-সংস্কৃতির প্রাচীন পরম্পরা গুরুত্ব পাওয়া এক্ষেত্রে উচিত।

তবে বাংলাদেশের বাংলা একাডেমি (১৯৫৫) কীভাবে এ যাবৎ বাংলা ভাষার অবয়ব সংস্কার করেছে, ভারতীয় বাঙালিদের সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তা কতটা মান্যতা দেওয়া যায়, তাও ভাবা যেতে পারে। তবে ভারতীয় বাংলার যে সনাতনী ঐতিহ্য-ভিত্তি স্বীকৃত হয়েছে, তা অবশ্য বজায় রাখা বিধেয়। বাংলাদেশের ইসলামিক সংস্কৃতি-ঘেঁষা প্রবণতা পশ্চিমবঙ্গীয় বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হওয়া বিধেয় কিনা, তাও ভাবা আবশ্যক।

আবার বাংলা বানানের ক্ষেত্রে আমাদের নজর ও গুরুত্ব দেওয়া বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। কারণ একটি শব্দ কোন মূল ভাষা থেকে এসেছে, তার অনুসারী বানান লেখাটাই উচিত। সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে বেশিরভাগ বাংলা শব্দ সংস্কৃত অনুসারী তৎসম, অর্ধতৎসম, ভগ্ন-তৎসম, তদ্ভব হিসেবে যেমন গ্রাহ্য, তেমনি অন্যান্য ভাষা থেকেও গৃহীত হয়েছে। তৎসমের ক্ষেত্রে অন্য রূপ বানানের খবরদারি থাকা অনুচিত। আবার যে শব্দ হুবহু যে ভাষা থেকে আগত, সেগুলোকে অবিকৃত ভাবে উচ্চারণ ও লিপিতে নেওয়াটাই কর্তব্য। কিন্তু মার্কসবাদী সরকার বা চরম দুর্নীতিপরায়ণ দিদির সরকার ইংরেজি 'একাডেমী' শব্দকে বাংলায় 'আকাদেমি' হিসেবে গ্রহণ ও মান্যতা দিয়েই সন্তুষ্ট থাকল। অথচ শিক্ষিত বাঙালি এই আকাদেমি শব্দ মৌখিক ভাষা ব্যবহারে প্রয়োগ করে না, তারা অবিকৃত ভাবে ইংরেজি শব্দের উচ্চারণ করে থাকে। সেজন্য বাংলাদেশের বিদ্বজ্জন একাডেমি শব্দকে বাংলায় হুবহু নিয়েছেন। অন্যদিকে অনেক হিন্দিভাষী লোকজন কথ্য বা আঞ্চলিক প্রভাবে ইংরেজি অ্যাকাডেমি (Academy) শব্দটিকে 'অ্যাকাডেমি'-র বদলে কিছুটা 'অকাদেমি' বা 'অকৈডেমি' উচ্চারণের কাছাকাছি বলে থাকেন। হিন্দি ধ্বনিতত্ত্ব ও স্বরধ্বনির টানে ইংরেজি '!' (অ্যা) ধ্বনিটি অনেক সময় খর্ব হয়ে 'অ'-এর মতো উচ্চারিত হয়ে থাকে।

কাজেই, অন্য ভাষার শব্দ মাতৃভাষায় গ্রহণের ক্ষেত্রে একটা যুক্তিগ্রাহ্য ভিত্তি থাকা আবশ্যক।

নতুন নতুন ভাবে বাংলা শব্দ লাগু করতে হলে একটু সাত-পাঁচ বিবেচনাও করতে হয় (দ্রষ্টব্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'নূতন কথা গড়া' প্রবন্ধ)। নাহলে বাংলা ভাষার শব্দটি ইতিহাস ও সংস্কৃতির পক্ষের বোঝা বা ভার হিসেবে প্রতিপন্ন হতে পারে। অনর্থক বানান, পরিভাষা বা বিকল্প শব্দের বৃদ্ধি করে ভার বাড়িয়ে লাভ কি? এই ভাষার বোঝা পরবর্তী উত্তরসূরি শিক্ষার্থীদেরকে বয়ে বেড়াতে হলে তা যেমন বাঙালি সংস্কৃতির পক্ষে ভালো হতে পারে না, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বা শিক্ষার্থীর পক্ষেও তা বিপজ্জনক।

সংস্কারকৃত, ঐক্যবদ্ধ বাংলা লিপির প্রয়োগেই লেখা হওয়া বিধেয় ভারতীয় বাংলা ভাষা। যদিও বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের শেষ পর্ব ও আধুনিক যুগের সূচনা লগ্নে দেখা গেছিল রোমান লিপিতে বাংলা ভাষা লেখার প্রয়াস। একসময় বৃহত্তর সিলেটের অঞ্চলে বাংলা ভাষা লেখার জন্য স্বতন্ত্র সিলেটি নাগরি লিপি ব্যবহৃত হতো। নবাবী আমল ও মধ্যযুগের কিছু পুঁথি সাহিত্যে পরিবর্তিত বা বর্ধিত আরবি-ফার্সি হরফ ব্যবহার করে দোভাষী বা আরবি লিপিতে বাংলা লেখার প্রচলন ছিল। শুনেছি ঐতিহাসিক ও প্রশাসনিক কাজে ষোড়শ শতাব্দী থেকে উত্তর ও পূর্ব ভারতে ভোজপুরি, মৈথিলি ও হিন্দির পাশাপাশি কিছু ক্ষেত্রে বাংলা ও বাংলা-মিশ্রিত স্থানীয় ভাষা (যেমন উত্তর দিনাজপুরের সূর্যাপুরী) লেখার জন্যও কাইথি (কায়েথি) লিপি ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে সমাজমাধ্যমে চ্যাট মেসেজ করার সময় আমরা ইংরেজি ফন্ট দিয়ে বাংলা ভাষা লিখে থাকি। অনেক সময় বাংরেজি ফন্টও ব্যবহার করি।

এই ধরনের বহুবিধ ও ভাষার লিপিতে বাংলা লেখা নিষিদ্ধ হওয়া দরকার, যেহেতু বিদ্যাসাগর সংস্কারকৃত বাংলা লিপি দিয়ে আমাদের ভাব প্রকাশ ও সৃজনশীল সাহিত্য লেখার কাজ আজও সচল রয়েছে। প্রয়োজনে কিছু বাংলা লিপির সংস্কার বা গ্রহণ-বর্জন করা যেতে পারে। যদিও বর্জন করার ক্ষেত্রে অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্য স্মরণে রেখে তা করা বিধেয়। নইলে দেশভাগের পর পাঞ্জাবি ভাষা যেমন হিন্দি, উর্দু ও গুরুমুখী লিপিতে লেখা সচল রয়েছে, তেমনি বাংলার ক্ষেত্রেও বহুধা লিপি প্রযুক্ত হলে তা সংস্কৃতি চর্চার পক্ষে মারাত্মক ভারবহুল হতে পারে।

বাংলা বানান, পরিভাষার উন্নয়নের জন্য কেবল কাগুজে অভিধান বা বিশ্বকোষ প্রণয়ন করলে চলবে না, এখন যেহেতু নানা প্রযুক্তির সমুন্নতি ঘটেছে, সেজন্য কাজের সময় তড়িঘড়ি কোনও বানান বা পরিভাষা অনলাইনে সার্চ করলে যেন ভারতীয় বাংলা ভাষার শব্দ বা পরিভাষা হিসেবে সেটি তৎক্ষণাৎ আন্তর্জালিক সার্চ ইঞ্জিনে সন্ধানকারী দেখে নিতে পারেন। এই ব্যবস্থা রাজ্য তথা কেন্দ্র সরকারকে বাংলা ভাষার প্রযুক্তিগত উন্নয়ন করে আজকের প্রেক্ষিত ও প্রয়োজন পূরণকে কার্যকর ও সচল রাখতে হবে।

ভারতীয় বাঙালিদের শিক্ষা সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে সুচারু ভাবে বাংলা ভাষার প্রয়োগ হচ্ছে কিনা, তা দেখভাল করার জন্য উচ্চ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষা-রক্ষক হিসেবে একটি ইন্টার্নশিপ বা প্রকল্প রাখা যেতে পারে। অথবা মাতৃভাষার প্রতি যাদের অনুরাগ বা প্রেম-প্রীতি সুগভীর, তাদের মাতৃভাষার করসেবক বা স্বেচ্ছাসেবক বা মাতৃভাষা পর্যবেক্ষক (কবি সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় 'ভাষা-পুলিশ') নিয়োগ করে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞাপন, ব্যানার-ফেস্টুন, রাস্তাঘাটের দেওয়াল লিখন ইত্যাদিতে বাংলা ভাষা রয়েছে কিনা, সেগুলির রিপোর্টিং করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

পরিশেষে বলার কথা এই যে ১৯৬১-তে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার সরকারি ভাষা আইন প্রণয়ন করে ১৯৬২ থেকে প্রয়োগের পরিকল্পনা করেও সেভাবে মাতৃভাষা বাংলার সর্বস্তরে প্রয়োগ কার্যকরী হয়নি। তবে রাষ্ট্রবাদী নতুন সরকারের সদিচ্ছা অসম্ভবকে সম্ভব করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। আর তা যদি কার্যকরী হয়, তাহলে ভারতকেশরী, মাতৃভাষা-প্রেমী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সওয়া শতবর্ষ উৎযাপন হয়ে উঠবে সফল ও সার্থক। ■

শোকবার্তা

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মধ্য কলকাতা জেলার সহ- সভাপতি অলোক গুপ্তার ভ্রাতা শ্রীনবীন গুপ্ত ইহলোক ত্যাগ করে পরলোক গমন করেছেন। ওঁনার অকাল প্রয়াণে আমরা শোকাহত এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারকে আমাদের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করি। ভগবানের শ্রীচরণে ওঁনার আত্মার স্থান পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করি। ভগবান এই কঠিন সময়ে পরিবারবর্গকে শোক সহ্য করার শক্তি প্রদান করুন এই প্রার্থনা জানাই। ওঁম শান্তি, ওঁম শান্তি।

ভারতমাতার আরতী

ওঁ জয় ভারত মাতা, মৈয়া জয় ভারত মাতা।
জো জন তুঝকো ধ্যাতা (২) সুখ সম্পদ পাতা।। ওঁ জয়...।। ধ্রু।।

ঋষি মুনিয়োঁ নে তেরী মহিমা হ্যায় গায়ী।
ঋদ্ধি সিদ্ধি দে তুনে (২) প্রভুতা প্রকটাঈ।। ওঁ জয়... (১)

রাম কৃষ্ণ মহাবীর বুদ্ধ ঔর নানক সুত তেরে।
বাল্মীকি রবিদাস সন্ত সব (২) গুণ গায়ে তেরে।। ওঁ জয়... (২)

যবন, হুণ, শক আএ, সবকো সমা লিয়া।
আক্রামক রিপুওঁ কো (২) তুনে নষ্ট কিয়া।। ওঁ জয়.... (৩)

হিন্দু জাতি সব মিলকর যহ সঙ্কল্প করেঁ।
ভক্তি ভাব হো মন মেঁ (২), প্রেম প্রবাহ বহে।। ওঁ জয়.... (৪)

সচ্চে মন সে মাঁ কা, জো গুণ গান করেঁ।
মন বাঞ্ছিত ফল পাবে (২) জীবন সফল করে।। ওঁ জয়.... (৫)

Best Wishes from :

NILAY SARKAR

S. N. MAJUMDAR ROAD
[Near Munshirbagan]

Vill-Sainpala, Ward No.-8
P.O. & P.S.-Basirhat-743411
Dist-North 24 Parganas

With best compliments from :

GLOBAL
CONTAINER LINES (I) PVT LTD

Global

Container Lines India Private Limited

Corp. Office :

606, 6th Floor, 'B' Wing, Mittal Commercia, Hasan Pada Road
Marol, Andheri (East), Mumbai-400059
Tel. : +91 22 28562425 / 26 / 27 / 28 ● E-mail : daud@gclipl.com

Regd. Office Address :

3rd Floor, Flat No. 304, Lake View CHS Ltd. Matul Village Road,
Opp. Dena Bank, Mumbai-400059

We also have our branches :

KOLKATA, CHENNAI, COCHIN, TUTICORIN, JODHPUR, JAIPUR AND HYDERABAD

With Best Compliments From :

Mobile : 9153457289

DR. K. P. BISWAS

Associate Doctor of District Hospital Alipurduar

NEW SHRI KRISHNA NURSING HOME

Alipurduar-736122

With Best Compliments From :

DR. SAUMYAJIT DATTA

MBBS (Kol), D.L.O. (Kol), M.S. (Kol)

(ENT & HEAD-NECK SURGERY)

Regd. No. : 53088 (W.B.M.C.)

GOLD MEDALIST

DNB Senior Faculty & Head of the Department

Department of ENT & Head-Neck Surgery

ALIPURDUAR DISTRICT HOSPITAL

ডাঃ সৌম্যজিৎ দত্ত

এম.বি.বি.এস. (কোল), ডি.এল.ও. (কোল)

এম.এস. (কোল)

(ই.এন.টি. ও হেড-নেক সার্জারী)

গোল্ড মেডেলিস্ট

ডিএনবি সিনিয়র ফ্যাকাল্টি অ্যান্ড হেড অফ দ্যা ডিপার্টমেন্ট

ডিপার্টমেন্ট অফ ইএনটি অ্যান্ড হেড-নেক সার্জারী

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল

ই.সি.জি.-র ব্যবস্থা আছে ● **ECG DONE HERE**

Mobile : 9614847671 / 9563032858 ● WhatsApp No. : 9614434655

বাড়িতে রোগী দেখার সময় : বিকাল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা (বৃহস্পতিবার বাদে)

রাত্রি ৯টা থেকে ১০টা

দুর্গাবাহিনী প্রার্থনা

অয়ে দেবী দুর্গে মহাশক্তিরূপে।
মহামঙ্গলে বৎসলে মাতৃভূমে।।
ত্বমেকা ভবানী ত্বমেকা শরণ্যা।
বিধাত্র্যৈ শিবায়ৈ নমস্তে নমস্তে।। ১।।

ত্বয়া প্রেরিতাঃ স্মো বয়ং বীরবালাঃ।
শুভকর্ম কর্ত্তুং বিজেতুং রণঞ্চ।।
স্বদেশে বিদেশে সুকার্য বিকীর্য্য।
সদাচারবৃত্তিং বয়ং স্থাপয়ামঃ।। ২।।

স্মৃতিং শীলমানতিং সৎপ্রবৃত্তিম্।
দয়াভাবনা মেকতামাত্মশক্তিম্।।
ইমাঃ সার্বিকা যচ্ছ চাস্মৎকৃতে ত্বম্।
যতো ভারতে সন্তু নার্য্যঃ সমর্থাঃ।। ৩।।

সদা রক্ষিতুং হিন্দু ধর্মং বরেণ্যম্।
নিহন্তুং খলান্ সাধুবৃন্দঞ্চ পাতুম্।।
সমুন্নেতুমেতদ্ বরং হিন্দুরাষ্ট্রম্।
জয়ে পুণ্যভূমে শুভে দেহি শক্তিম্।। ৪।।

দুর্গা মাতা কী জয়। ভারত মাতা কী জয়।।

SATYANARAYAN MONDAL

43W, ULTADANGA ROAD
KOLKATA-700006

DUROPLY®

70 Years of Excellence

70 saal ka bharosa, lifetime guarantee ka waada.

For 70 years, Duroply has been crafting a legacy of precision, trust, and uncompromising quality. Much like timeless poetry, true craftsmanship only grows more meaningful with time, creating spaces that endure for generations.

Scan to know more

Duroply Industries Limited

Head Office: 113 Park Street, North Block, 4th Floor, Kolkata - 700016

Corporate Office: 1/35, W.H.S., Kirti Nagar, New Delhi - 110015 | **CIN:** L20211WB1957PLCO23493

Toll Free: 1800-345-3876 | **Email:** enquiry@duroply.com | **Website:** www.duroply.in

Find us on:

শান্তি তুমি কোথায়?

সমীরণ ভৌমিক

'শান্তি তুমি কোথায়' এই আধ্যাত্মিক প্রবন্ধটির শুরুতেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিরস্মরণীয় কবিতা দিয়ে আমার লেখার ভূমিকা শুরু করছি—''সদা থাকো আনন্দে, সংসারে নির্ভয়ে নির্মল প্রাণে। জাগো প্রাতে আনন্দে,করো কর্ম আনন্দে, সন্ধ্যায় গৃহে চলো হে আনন্দ গানে। সংকটে -সম্পদে থাকো কল্যাণে, থাকো আনন্দে নিন্দা-অপমানে। সবারে ক্ষমা করি থাকো আনন্দে, চির-অমৃত নির্ঝরে শান্তিরস পানে।'' জগৎবাসীর উদ্দেশ্যে বিশ্ব মহামানব স্বামী বিবেকানন্দের মুখনিঃসৃত অমৃত কথা 'ধর্ম এমন একটি ভাব যা পশুকে মনুষ্যত্বে ও মানুষকে দেবত্বে উন্নিত করে।' ধর্মই পারে মানুষকে মান-হুঁশে পৌঁছাতে। আমাদের জীবনে সব আছে কিন্তু বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতির হাহাকারময় জীবনে কিছু একটা নেই! একদা এক সময় একান্নবর্তী পরিবার ছিল এখন সেটি ভেঙে দশ টুকরো হয়ে গেছে। তুমি আর আমি আর আমাদের সন্তান এই আমাদের পৃথিবী হয়ে গেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন ''আপনাতে আপনি থেকো মন যেও নাকো কারো ঘরে—যা চাবি তা বসে পাবি খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।'' আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন খুঁজি তারে আমি আপনায়। আমাদের নিজেদের হৃদয় মন্দিরে শান্তি আছে তাই খোঁজ খোঁজ খুঁজলে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন। কোন প্রেমিকের লীলায় জগৎ সাজে বৃন্দাবন। কারণ ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা। জগৎ জননী মা সারদাদেবী বলেছেন—''সন্তোষের সমান ধন নেই—সহ্যগুণের মতো বড় গুণ নেই।'' তাহলে কেন আমরা মরীচিকার পিছনে ছুটবে। স্বামীজী বলেছেন, দিনের শেষে নিজের সঙ্গে নিজেকে পাঁচ মিনিট কথা বলতে, আত্মবিশ্লেষণ করতে অর্থাৎ সেলফ্ এনালাইসিস করতে। তখনই বিবেকের কণ্ঠস্বর শোনা যাবে। বিবেকের কণ্ঠস্বর হল ভগবানেরই কণ্ঠস্বর। তবুও মানুষ শান্তি খোঁজে! শান্তি তুমি কোথায়? অ্যাম্বুলেন্সে করে শান্তি চলে গিয়েছে হসপিটালের ICU-তে। জীবনের ডাক্তার (ডাক-তাঁর) চলে এসেছেন মৃত্যুর দোরগোড়ায়।

জগৎ জননী মা সারদার লীলাসঙ্গিনী গৌরী মাতা বলেছেন, ''এমন একটা দিন বৃথা না যায় যেদিন তোমার হরি কথা উচ্চারণ হলোনি।'' কি হরি কথা? আমাদের চঞ্চল মনকে, লোভে আসক্ত আকাঙ্ক্ষিত মনকে, জড় জগতের উচ্চাভিলাসকে আধ্যাত্মিক মননে, ভগবৎ চিন্তার স্মরণ ও মনন করাকেই হরি কথা বলে। ভগবানের নাম স্মরণ ও মনন করার কথাই হল আসল কথা। ঈশ্বরই একমাত্র সত্য আর বাকি সব অনিত্য। জগৎ জননী মা সারদাদেবী বলেছেন, ''যে সত্যকে ধরে আছে সে ঠাকুরের কোলে শুয়ে আছে।'' যা কিছু আধ্যাত্মিক কথা, চিরন্তন সত্য কথা, সৎ চিন্তা, সৎভাবনা, সৎসঙ্গ, সাধুসঙ্গ, ভালোকথা আমাদের শুনতে হবে আর বাকি সব বাজে কথা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, ''সত্য কথাই হল কলির তপস্যা।'' আমাদের চাই ১৬ আনা ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ। আমাদের বলতে হবে হে দেবাদিদেব মহাদেব আমাদের তনু-মন-প্রাণ তুমি আত্মসাৎ করে নিয়েছ। আমাদের বিদ্যামায়ার চৈতন্য হোক। কি বিদ্যামায়া? বিবেক ও বৈরাগ্যের চৈতন্য হোক। আমাদের অবিদ্যামায়া তুমি ধ্বংস করে দাও। ঘুম ভাঙলে সকালে না ভাঙ্গলে পরকাল। তখন আর মৃত্যু ভয় থাকে না। মৃত্যু সে তো দেহের আত্মার নয়। অমৃতস্য পুত্র আমরা মৃত্যু মোদের নাহিরে আর। তাই স্বামীজী বলেছেন, ''জীবনে এসেছ যখন একটা দাগ কেটে যাও। এসো, মানুষ হও।'' সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস আর অসৎ সঙ্গে নরকবাস। বিশ্ব মহামানব স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ''বিবেকের কণ্ঠস্বরই হল ভগবানের কণ্ঠস্বর।'' অথচ সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। আমরা আজও ঠিকমতো মানুষ হতে পারিনি। আমাদের কৃতকর্ম আমাদেরকে ছাড়বে না। এই জন্মের কর্মফল এই জন্মেই আমাদের ভুগতে হবে। পাপ কখন তার বাপকেও ছাড়ে না। সৎ কর্মের ফল সৎকর্মী ও তাঁর পরিবার পাবেই আর কুকর্ম-দুষ্কর্মের ফল অসৎ কর্মী এবং অনেকটা সেই পরিবারের উপর অবশ্যই বর্তাবে। মা সারদাদেবী বলেছেন যে তাঁকে নিয়ে চলছে তাঁর জীবনে দুঃখ-কষ্ট আছে কিন্তু সে ভেঙে পড়বে না। বিপদে যেখানে লাঙলের ফাল ঢোকার কথা সেখানে সামান্য ছুঁচ ফুটবে। তাই প্রখ্যাত

সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের একটি কথা উদ্ধৃত না করে পারলাম না ''উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনে সাময়িক আনন্দ হয়ত আছে কিন্তু কোন ভবিষ্যৎ নেই। সময় থাকতে এটাই বুঝতে পারে না মানুষ।'' হাই, হ্যালো, বাই নামক আমাদের বিশৃঙ্খল লাইফ স্টাইল, জীবন ও যৌবনের 'উত্তাল ঢেউ সাগরে' ঢলে পড়া, বোল্ড রিলেশনে আজকের তথাকথিত উন্নত, উচ্চ শিক্ষিত আধুনিক মানুষ আসক্ত হয়ে পড়ছে। পরকীয়ায় স্বামী স্ত্রীকে ঠকাচ্ছে—অন্যদিকে স্ত্রী স্বামীকে ঠকাচ্ছে। তার ফলে আজকের সমাজে আখছার ঘটে চলেছে স্ত্রী থেকে পরস্ত্রী এবং স্বামী থেকে আসামী। বিবাহ বিচ্ছেদ (ডিভোর্স) যেন আজকের আধুনিক সমাজের মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দানা বেঁধেছে। কথা দিয়ে কথা না রাখা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, তঞ্চকতা, বিশ্বাসঘাতকতা আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। প্রকৃতি যত না মানুষ মারে তার থেকে মানুষ মানুষকে বেশি মারে। সেই মার যেটি দৈহিক এবং মানসিকভাবে আমাদের আঘাত হানে। আমরা নটী বিনোদিনী, ভক্ত প্রহ্লাদ, যবন হরিদাস, গৃহীভক্ত নাগ মহাশয়, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের রানী রাসমনির জামাতা মথুরামোহন বিশ্বাস এবং সর্বপরি নাট্যকার ভক্ত ভৈরব গিরিশচন্দ্র ঘোষের মতো ষোল আনা নিজেদেরকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে আত্মসমর্পণ করতে কি পেরেছি? তবেই তো গিরিশচন্দ্রের মতো চোখের জলে বলতে পারব—ঠাকুর আমি কিছু জানি না, আমি মাতাল, পাপী, কোথায় থাকি, কোথায় ঘুমাই তা জানি না। আমার পাপ নাও, পুণ্য নাও, লাভ নাও, লোকসান নাও, ভালো নাও, মন্দ নাও, আমার আমিত্য তুমি নাও ঠাকুর। তুমি আমার হাত দুটো শক্ত করে ধরো এবং জীবনের এই দুর্গম পথকে ঠাকুর তুমি সুগম পথে এগিয়ে নিয়ে চল। আমার হাত ধরে নিয়ে চলো সখা আমি পথ ক্লান্ত। আমার আমিত্বের বকলমা তোমার পায়ে নিবেদন করলাম।

আমরা কি মহাভারতের বিদুষী নারী কুন্তীর মতো বলতে পেরেছি 'হে কৃষ্ণ তুমি সারা জীবন দুঃখই দাও—দুঃখ না দিলে তোমায় ভুলে থাকব।' আমরা কি রাম ভক্ত হনুমানের মতো বুক চিরে দেখাতে পেরেছি এবং বলতে পেরেছি আমি তিথি নক্ষত্র কিছু জানি না, বুঝি না, বুঝতেও চাই না। আমি শুধু আমার প্রভু ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ও মাতা জানো কি দেবীকেই জানি এবং এই হৃদয়ে ওনাদের বাস। আমরা কি ভক্ত প্রহল্লাদের মতো শত অত্যাচার, কষ্ট সহ্য করেও হরিনাম করা কি শিখেছি? আমরা কি সেই পরম মুসলিম ভক্ত যবন হরিদাস যিনি নাকি বাইস বাজারে কাজির হুকুমে বেত্রাঘাত সহ্য করেও হরিনাম করা ছারেননি। 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' ঠাকুর আমাদের স্বভাব ইন্দুরের মতো হয়ে গিয়েছে। শুধু কাটা স্বভাব জুড়তে শিখিনি। মানুষ পরনিন্দা, পরচর্চায় মেতে উঠেছে। অথচ মহাপুরুষরা বারবার বলেছেন পরচর্চা মানে পরের দোষ কুড়িয়ে নিয়ে নিজে কলঙ্কিত হওয়া। পরচর্চা করা মানে আত্মচর্চা থেকে বঞ্চিত হওয়া। পরচর্চা, পরনিন্দা করা ভ্রুণ হত্যার মতোই মহাপাপ। তাই আমাদের বিশ্ব জননী মা সারদাদেবী বলেছেন 'যদি শান্তি পেতে চাও কারো দোষ দেখ না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখো। কেউ পর নয়, জগৎ তোমার।'

বর্তমান আজকের এই আধুনিক ব্যস্তময় সমাজে, এই অস্থিরতার জীবনে, হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের জীবনে, ফেসবুক-চ্যাটের যুগে, ইন্টারনেটের যুগে, স্যাটেলাইটের যুগে, দুনিয়া মুঠঠিমের যুগে, ফাস্টফুডের জীবনে, হাই-হ্যালো-বাই এর জীবনে আমরা যদি ভগবৎ পথে চলিবার জন্য স্বল্পমাত্র প্রযত্ন হই তবে কখন আমরা বিনষ্ট হব না। একদিন আমাদের এই অস্থিরতা, অশান্তির ঝড় থেমে যাবে। পৃথিবী আবার শান্ত হবে। শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বে মঙ্গল কামনার প্রার্থনা গান দিয়ে আমার লেখার ইতি টানছি—'বরিষ ধরা- মাঝে শান্তির বারি। শুষ্ক হৃদয় লয়ে আছি দাঁড়াইয়ে উর্ধ্বমুখে নরনারী। না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহ পাপ, না থাকে শোক পরিতাপ। হৃদয় বিমল হোক, প্রাণ সবল হোক বিঘ্ন দাও অপসারি। কেন এ হিংসা দ্বেষ, কেন এ ছদ্মবেশ, কেন এ মান-অভিমান, বিতর 'বিতর' প্রেম পাষাণ হৃদয়ে, জয় জয় হোক তোমারি।' হরি ওম তৎ সৎ। ■

গ্রন্থ সমালোচনা

'আমি বাংলাদেশি উদ্বাস্তু বলছি' গ্রন্থের লেখক মাননীয় ওমপ্রকাশ ঘোষরায় একজন উদ্বাস্তু মানুষ হয়ে উদ্বাস্তুর সমস্যার, বেদনার, যন্ত্রণার কথা অনুভব করেছেন। জীবন অভিজ্ঞতা দিয়ে এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু নির্মাণ করেছেন। বর্তমান বাংলাদেশের হিন্দু বাঙালির ইতিকথা ফুটে উঠেছে এই গ্রন্থে। যা সমস্ত হিন্দুদের জ্ঞাতার্থে জানা উচিত।

वन्दे मातरम् : राष्ट्रचेतना का अमर स्वर

भारत की साझा सभ्यतागत स्मृति और राष्ट्रीय एकात्मता का आह्वान

प्रशांत सिंघानिया

भारत के राष्ट्रीय जीवन में कुछ शब्द ऐसे हैं, जो शब्दों की सीमा से बहुत आगे निकल जाते हैं। वे पीढ़ियों को जोड़ने वाली चेतना बन जाते हैं। 'वन्दे मातरम्' ऐसा ही एक अमर उद्घोष है। यह केवल एक गीत नहीं; यह उस मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता, श्रद्धा और समर्पण की अनुभूति है, जिसने सहस्राब्दियों से असंख्य पीढ़ियों को जीवन दिया। पराधीन भारत में इसी स्वर ने करोड़ों भारतीयों के भीतर स्वतंत्रता, स्वाभिमान और आत्मबल की ज्वाला प्रज्वलित की।

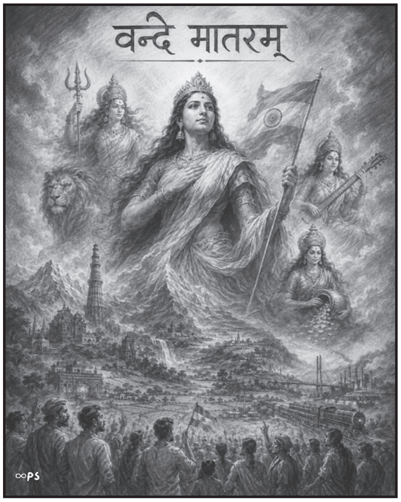

आज जब वन्दे मातरम् के पूर्ण स्वरूप को पुनः राष्ट्रीय जीवन में उसका उचित स्थान मिल रहा है, तब इसे किसी विवाद के चश्मे से देखने का कोई कारण नहीं है। भारत को अपने इतिहास, अपनी सभ्यता और अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति आत्मविश्वासी होना चाहिए। जिन प्रतीकों ने हमारी राष्ट्रीय चेतना को गढ़ने में योगदान दिया, उन्हें राजनीतिक सुविधा के लिए सीमित करना न इतिहास के प्रति न्याय हैं, न राष्ट्र के प्रति।

जिसने स्वतंत्रता-संग्राम को स्वर दिया

महामना बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय जी ने आनन्दमठ में 'वन्दे मातरम्' की रचना की। 1896 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने इसे पहली बार कांग्रेस के मंच पर गाया। उस अधिवेशन के अध्यक्ष रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। इसके बाद यह राष्ट्रीय आंदोलन के सार्वजनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया। 1896 से 1937 तक कांग्रेस के अधिवेशनों और राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण अवसरों पर वन्दे मातरम् का पूर्ण स्वरूप गाया जाता रहा। यह तथ्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है।

1905 के बंग-भंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन में यह जन-जन की आवाज बन गया। विद्यार्थी, क्रांतिकारी और सामान्य नागरिक-असंख्य भारतीय इसे गाते हुए विदेशी सत्ता को चुनौती देते थे। उस समय भारत एक साझा उद्देश्य के लिए खड़ा था। विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष ने जाति, भाषा और सम्प्रदाय की अनेक सीमाओं को पीछे छोड़ दिया था। वन्दे मातरम् उस जागते हुए भारत की सामूहिक चेतना का स्वर था।

1923 के कांग्रेस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने की थी, इसके गायन पर आपत्ति उठाई गई। फिर भी इसका पूर्ण गायन हुआ और राष्ट्रीय आंदोलन में इसका महत्व बना रहा। फिर 1937 में परिस्थिति बदली। कांग्रेस ने राष्ट्रीय सभाओं में वन्दे मातरम् के उन अंशों के गायन तक सीमित रहने का निर्णय लिया, जिन्हें व्यापक रूप से राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। यहाँ इतिहास हमारे सामने एक गंभीर प्रश्न रखता है—जिस रचना को राष्ट्रीय आंदोलन ने दशकों तक उसके पूर्ण स्वरूप में स्वीकार किया, उसके मूल स्वरूप को बाद में सीमित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह केवल कुछ पंक्तियों का प्रश्न नहीं था। यह उस मानसिकता का प्रश्न था जिसमें राष्ट्रीय संस्कृति के प्रतीकों को साम्प्रदायिक आपत्तियों के आधार पर सीमित किया जाने लगा। और इतिहास ने आगे चलकर इसकी कीमत भी चुकाई।

मूल अंतरे : हमारी सभ्यतागत स्मृति का आयाम

वन्द मातरम् के बाद के अंतरों में भारतमाता का स्वरूप शक्ति, ज्ञान और समृद्धि के सांस्कृतिक प्रतीकों के माध्यम से उभरता है। दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी भारतीय मानस में केवल आराधना के प्रतीक नहीं, बल्कि शक्ति, ज्ञान और समृद्धि के आदर्शों की अभिव्यक्ति भी हैं।

भारतभूमि को माता के रूप में देखना कोई आधुनिक राजनीतिक कल्पना नहीं है। यह हमारी प्राचीन सभ्यतागत दृष्टि का स्वाभाविक विस्तार है। भारत में अनेक मत-पंथों को मानने वाले लोग रहते हैं। उनके वर्तमान धार्मिक आचरण भिन्न हो सकते हैं; लेकिन उनकी मातृभूमि, उनकी ऐतिहासिक स्मृतियाँ और इस भूमि की दीर्घ सभ्यतागत यात्रा उनसे अलग नहीं हो जाती।

धर्म-पद्धति बदल सकती है; पूर्वजों की भूमि और सभ्यता की स्मृति नहीं बदलती। इसीलिए वन्दे मातरम् को किसी धार्मिक विभाजन का प्रतीक बनाना उसके व्यापक अर्थ को सीमित करना है। यह उस भूमि के प्रति श्रद्धा है, जिसे भारत ने सहस्रों वर्षों में अपनी चेतना से निर्मित किया है। हमारे पुराणों में भारतभूमि के प्रति इसी गौरव का अद्भुत भाव मिलता है—गायन्ति देवाः किल गीतकानि, धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे। अर्थात् देवता भी कहते हैं कि भारतभूमि में जन्म लेना धन्य है। यह भाव किसी एक सम्प्रदाय की सीमा में नहीं बँधता। यह भारत की सभ्यतागत आत्मचेतना का हिस्सा है।

विभाजन की राजनीति और इतिहास की चेतावनी

अंग्रेजों ने भारत को केवल अपनी सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि "Divide and Rule" की नीति से भी कमजोर किया। जो समाज विदेशी शासन के विरुद्ध एकजुट हो रहा था, उसकी सामाजिक और राजनीतिक एकता को तोड़ना औपनिवेशिक सत्ता के हित में था। 1905 का बंग-भंग विरोधी आंदोलन इसका विपरीत उदाहरण था—भारत के विभिन्न समुदायों ने मिलकर विदेशी सत्ता को चुनौती दी। लेकिन अगले दशकों में धार्मिक आधार पर अलग राजनीतिक पहचान की माँगें बढ़ती गईं। अंततः 1947 में देश का धार्मिक आधार पर विभाजन हुआ।

विभाजन ने केवल भूगोल नहीं बाँटा उसने घर उजाड़े, परिवार बिछुड़ाए और पीढ़ियों की स्मृति पर गहरे घाव छोड़े। इस इतिहास के बाद हमें एक प्रश्न स्वयं से पूछना चाहिए-क्या आज भी जाति, सम्प्रदाय, भाषा और क्षेत्र की अस्थायी पहचानों को राष्ट्रीय पहचान से ऊपर रखकर हम उसी विभाजनकारी मानसिकता को पुनर्जीवित करना चाहते हैं? उत्तर स्पष्ट होना चाहिए—नहीं!

औपनिवेशिक काल का विभाजनकारी विष आज भी राजनीति के विभिन्न रूपों में अपना प्रभाव दिखा सकता है। तुष्टीकरण और पहचान-आधारित राजनीति यदि नागरिकों को उनके साझा राष्ट्रीय आधार से दूर करती है, तो उसे चुनौती देने का मार्ग किसी समुदाय से संघर्ष नहीं, बल्कि सभ्यतागत एकात्मता को पुनः जागृत करना है। हमें उस स्मृति को मजबुत करना होगा जो हमें बताती है कि हम केवल वर्तमान की अलग-अलग पहचानें नहीं हीं; हम एक दीर्घ राष्ट्रीय यात्रा के उत्तराधिकारी हैं।

अपनी जड़ों से कटकर कोई राष्ट्र शक्तिशाली नहीं बनता

किसी राष्ट्र को आधुनिक बनाने का अर्थ उसकी स्मृति मिटाना नहीं होता। जो राष्ट्र अपनी विरासत और अपने पूर्वजों से कट जाता है, वह आधुनिक तो दिखाई दे सकता है, पर आत्मविश्वासी नहीं बन सकता। अपनी सभ्यतागत स्मृति को मिटाकर किसी समाज को अधिक उदार, अधिक आधुनिक या अधिक एकजुट नहीं बनाया जा सकता। इसके विपरीत, अपनी जड़ों की पहचान व्यक्ति और राष्ट्र दोनों को आत्मविश्वास देती है।

भारत की शक्ति इसी में रही है कि उसने विविधताओं को स्थान दिया, लेकिन अपनी मूल सभ्यतागत चेतना को कभी पूरी तरह छोड़ा नहीं। इसलिए हमारी राष्ट्रीय एकता का आधार केवल राजनीतिक या संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। उसके पीछे वह सांस्कृतिक स्मृति भी है जिसने इस विशाल भूभाग को हजारों वर्षों तक एक भावभूमि में बाँधे रखा। वन्दे मातरम् उसी स्मृति को शब्द देता है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय गरिमा

लोकतंत्र व्यक्ति को असहमति का अधिकार देता है। कोई व्यक्ति किसी गीत की व्याख्या से सहमत हो या न हो—यह उसका अधिकार हो सकता है। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि राष्ट्रीय प्रतीकों के स्वरूप और गरिमा को राजनीतिक दबाव या साम्प्रदायिक आग्रह के अनुसार बार-बार सीमित किया जाए। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत सामान्य रचनाएँ नहीं हैं। वे राष्ट्र की स्मृति, सम्मान और सामूहिक भावबोध के प्रतीक हैं।

इसीलिए उनके जानबूझकर अपमान या अवमानना के विरुद्ध वैधानिक संरक्षण आवश्यक है। 2026 में वन्दे मातरम् को भी राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े कानूनी संरक्षण के दायरे में लाने का निर्णय इसी व्यापक सिद्धान्त की अभिव्यक्ति है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का निषेध नहीं

है। व्यक्ति को असहमति का अधिकार है; राष्ट्र को अपनी गरिमा की रक्षा का अधिकार और दायित्व दोनों हैं। राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' के नाम पर कमजोर करना लोकतंत्र को मजबूत करना नहीं है।

पूर्ण वन्दे मातरम् : अतीत का परिष्कार, भविष्य का संकल्प

मूल वन्दे मातरम् को उसके पूर्ण ऐतिहासिक स्वरूप में पुनः प्रतिष्ठित करना एक ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने और राष्ट्रीय स्मृति को उसके व्यापक स्वरूप में पुनर्स्थापित करने का प्रयास है। जिस रचना ने स्वतंत्रता-संग्राम को ऊर्जा दी, क्रांतिकारियों को प्रेरित किया और भारतमाता के प्रति समर्पण की भावना को जन-जन तक पहुँचाया, उसके मूल स्वरूप को राजनीतिक दबावों के कारण सीमित करना उचित नहीं था।

आज उस ऐतिहासिक अपूर्णता को ठीक करना आत्मविश्वास का परिचायक है। यह किसी के विरुद्ध नहीं है। यह भारत के पक्ष में है। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। माँ को प्रणाम करने वाला पुत्र अपने भाई से नहीं लड़ता। वह दोनों को एक ही मातृभूमि की संतान मानता है। यदि वन्दे मातरम् हमारी साझा मातृभूमि का स्मरण कराए, तो वह विभाजन का नहीं, मिलन का माध्यम बनेगा।

वन्दे मातरम् : साझा अतीत से साझा भविष्य तक

आज आवश्यकता केवल यह कहने की नहीं कि वन्दे मातरम् हमारा राष्ट्रीय गीत है। आवश्यकता यह समझने की है कि यह हमारे राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में क्या भूमिका निभा सकता है। एक ऐसी पीढ़ी, जिसे अपने इतिहास से काट दिया गया हो, वह अपने भविष्य का निर्माण आत्मविश्वास से नहीं कर सकती। और जो समाज अपनी सभ्यतागत स्मृति को पहचानता है, वही आधुनिकता को भी बिना आत्महीनता के स्वीकार कर सकता है।

इसलिए वन्दे मातरम् को विद्यालयों, सार्वजनिक जीवन और राष्ट्रीय अवसरों पर केवल औपचारिक गायन तक सीमित न रखा जाए। इसे भारत की साझा सभ्यतागत स्मृति का जीवंत स्मरण बनाया जाए। जब कोई बालक इसे गाए, तो वह जाने कि वह केवल एक गीत नहीं गा रहा—वह हजारों वर्षों की विरासत का उत्तराधिकारी है। जब कोई युवा इसे कहे, तो उसमें केवल भावुकता नहीं, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का संकल्प हो। और जब करोड़ों भारतीय इसे एक साथ गाएँ, तो उसमें मातृभूमि के प्रति अपना होना व्यक्त हो। यही भाव जाति, पंथ, भाषा और क्षेत्र की अस्थायी दीवारों से उपर उठ सकता है।

2047 : केवल विकास नहीं, राष्ट्रीय एकात्मता का संकल्प

विकसित भारत @2047 केवल आर्थिक समृद्धि, आधुनिक तकनीक और विश्वस्तरीय अधोसंरचना का लक्ष्य नहीं हो सकता। भारत विकसित तब होगा, जब भारत को आत्मा भी एकजुट होगी। हमें एक साझा अतीत की स्वीकार करना होगा, वर्तमान की विविधताओं का सम्मान करना होगा और एक साझा भविष्य का निर्माण करना होगा। जाति, पंथ, भाषा और क्षेत्र हमारी विविधताएँ हैं; वे हमारी राष्ट्रीय नियति नहीं।

यदि हम अपनी सभ्यतागत स्मृति को लेकर संकोच करेंगे, तो विभाजनकारी शक्तियाँ हमारी छोटी-छोटी पहचानों को स्थायी संघर्ष में बदल सकती हैं। लेकिन यदि हम अपने साझा सांस्कृतिक आधार को पहचानेंगे, तो वही विविधताएँ भारत की शक्ति बन जाएँगी। 2047 का भारत उस दिन वास्तव में विकसित होगा, जब उसकी संतति स्वयं को अलग-अलग खाँचों में नहीं, एक महान सभ्यतागत यात्रा के सहयात्री के रूप में देखेगी। वन्दे मातरम् इस यात्रा का स्मरण बन सकता है। यह हमें याद दिला सकता है कि हमारी विविधताओं के नीचे एक ऐसी भूमि है जिसने हम सबको आश्रय दिया है; एक ऐसी सभ्यता है जिसने असंख्य धाराओं को अपने भीतर स्थान दिया है; और एक ऐसा राष्ट्र है जिसका भविष्य हम सबकी एकता पर निर्भर है।

अपनी जड़ों को मिटाकर हम एक मजबूत भारत नहीं बना सकते। अपनी जड़ों को पहचानकर, उन्हें आत्मविश्वास से स्वीकार करके और सबको साथ लेकर ही हम उस भारत का निर्माण कर सकते हैं जिसकी कल्पना 2047 के लिए की जा रही है। जब भारत की संतति एक स्वर में कहे—वन्दे मातरम्! तो उसमें केवल एक गीत की ध्वनि न हो। उसमें हो—एक सभ्यता का आत्मविश्वास, एक राष्ट्र की एकात्मता, एक मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता, और आने वाले भारत के निर्माण का अटूट संकल्प।

वन्दे मातरम्। जय हिन्द। ■

गोपीप्रेम

अरुण चूड़ीवाल

सन् 1940 में कल्याण का 15वाँ विशेषांक प्रकाशित हुआ था। इस 'साधनांक' में वृन्दावन की प्रेम साधना नामक लेख है। लेख गोपियों के अलौकिक प्रेम सम्बन्धी अंश उद्धृत है।

वृन्दावन! नाम का उच्चारण-स्मरण करने के साथ, कानों को चुपचाप यह नाम प्रेम और उत्कण्ठा से सुना देने के साथ ही मानस-पटल पर, भीतर से कैसे-कैसे सुन्दर उज्ज्वल चित्र हृदय की आँखों के सामने आने लग जाते हैं।

वृन्दावन! कमनीय कुसुमों की कुञ्जस्थली, मधुर विहग-काकली के प्रवाह, कालिन्दी के कलकल निनाद झङ्कृत और निर्झरों के रूपमे मन्दस्मित से युक्त वृन्दावन! सारा जीव-जगत् जहाँपर एक है और एकत्व के अनुभवमे आनन्दमग्न है!

मूर्तिमान् प्रेम पृथ्वी पर अवतीर्ण होने की इच्छासे वृन्दावन में पधारे और इसी को उन्होंने अपना धाम बनाया।

वृन्दावन में वे प्रेमस्वरूप किसलिये पधारे? वृन्दावन को उन्होंने अपना दिव्य धाम क्यों बनाया? इन गोप-गोपियों को क्या समझकर उन्होंने अपनाया, सिर चढ़ाया और अमर कर दिया?

कोई बात जरूर रही होगी। प्रेम की पुकार हर जगह हर समय हो रही है; पर सब कोई तो उसे नहीं सुन सकते, न उसके पीछे चल ही सकते हैं। कोई चीज़ इनके अंदर अवश्य रही होगी, जिससे इनके नेत्रों में वह निर्मलता आ गयी कि बालरूपधारी वृन्दावनविहारी को देखते ही इन्होंने पहचान लिया, आनन्द से उछल पड़े और उनकी भगवत्ता की महिमा का अनुभव कर उसी में डूब गयीं।

कोई चीज़ उनमें अंदर अवश्य रही होगी, जिससे इनका हृदय इतना विशुद्ध हो गया कि ज्यों ही वे इनके सामने आये, ये आत्मसमर्पण की सहज अदम्य दीप्ति और दमक के साथ सर्वात्मभाव से उनपर उत्सर्ग हो गये। यह 'कोई चीज़' क्या रही होगी?

इनके जीवनपर दृष्टि डालो। आडम्बरशून्य! और इनके घर इनकी धन-सम्पत्ति? वही गोधन! कितना सादा, कितना वे ही अरण्य-कुटीर! इनका आहार? वही दूध और माखन, दही और छाछ, कन्द-मूल अनाज और साग-भाजी! कितना सात्त्विक भोजन था! सात्त्विक मन और सात्त्विक शरीर ही उससे बनते थे। विलासिता किसे कहते हैं, यह तो वे जानती ही नहीं थीं। वहाँ लोभ, ईर्ष्या, द्वेष या भय के लिये स्थान ही कहाँ था। ये गोप-गोपी जन्मतः वानप्रस्थ थे। सहज कर्तव्यों का सच्चा और निष्काम पालनमात्र! ये संसार में अवश्य रहते थे, पर संसार के होकर नहीं! यही तो सच्ची-से-सच्ची साधना है।

सौन्दर्य सभी आध्यात्मिक शक्तियों को उन्नत और उत्कृष्ट बनाता है। गोपियाँ सौन्दर्य के बीच में रही थीं, सौन्दर्य से ही जीती थीं, सौन्दर्य-सुधा का ही पान करती थीं, सौन्दर्य में ही डूबी रहती थीं, उसीसे ये पवित्र और चिन्मय हो गयी थीं। यही कारण था कि प्रेमस्वरूप भगवान् जब मूर्तिमान् सौन्दर्य के रूप में इनके समीप आये तो इन्होंने उन्हें अपने हृदयों से लगा लिया और अपने हृदय उन्हें सौंप दिये!

गोपियाँ उन्हें ऐसे अलौकिक भावसे भजती थीं कि जिसके कारण इनकी भक्ति सदा के लिये मानव-जाति का आदर्श बन गयी हैं। इस मर्त्यलोक में गोपियों ने ही उन्हें वह प्रेम दिया, जो उनके उपयुक्त था। और इस प्रेम का मूल्य उनकी दृष्टि में इतना महान् था कि इसके बदले में उन्होंने अपने आपको ही इन्हें दे डाला। 'क्या प्रेम? केवल प्रेम? केवल प्रेममें इतनी ताकत है कि जो उन परात्परपर विजय प्राप्त करके उन्हें अपने अधीन कर सकता है?'

प्रेम क्या है? और क्या नहीं है। भलाई, उदारता, संयम और धैर्य, निःस्वार्थता और बलिदान, सहिष्णुता और साहस कौन-सी ऐसी चीज है, जो प्रेम में नहीं है? पवित्रतम, सत्तम और दिव्यतम गुणों में ऐसा कौन-सा तत्त्व है, जो प्रेम में नहीं है?

गोपियोंने प्रेम किया। यही उनकी तपस्या थी। उन्होंने सर्वोत्तम से प्रेम किया यही उनकी महिमा थी।

सर्वोत्तम, पुरुषोत्तम ने उनके प्रेम को अङ्गीकार किया। यही उनका पुरस्कार था।

इस दिव्यातिदिव्य आध्यात्मिक चमत्कारकी, जिसे 'गोपी-प्रेम' कहते हैं का अनुमान ही किया जा सकता है।

कहते हैं—मनुष्य जो कुछ सोचता है, वही उसका स्वरूप है। गोपियाँ श्रीकृष्ण का ही चिन्तन करती थीं, और किसी वस्तु अथवा व्यक्ति का नहीं। श्रीकृष्ण की उस दिव्य छवि को कोई भी गोपियों के नेत्रों में, उनके हृदयों में, उनके मनों में, उनकी आत्माओंतक में देख सकता है। कोई भी देख सकता है कि श्रीकृष्ण-मिलन की लालसा से उन्हींका अहर्निश चिन्तन करती हुई गोपिकाओ के तन-मन-प्राण से मानवता झड़ती जा रही है और उनके जीवन में क्रमशः श्रीकृष्ण की दिव्य पूर्णता प्रवेश कर रही है। यही तो साधना है—सबसे दिव्य, पावन और अमोघ साधना!

यह प्रेम वाणी द्वारा व्यक्त होने लगा। उनके विविध दिव्य गुणों का एक दूसरी से बखान करती हैं, वाणी के साथ उनका प्रेम बढ़ता है और प्रेम के साथ ज्ञान की वृद्धि होती है। और उनका ज्ञान के रूप में परिणत व्यापक प्रकाश हो जाता है, जिसके सामने उनके तन-मन-प्राण के किसी कोने-करते में भी अज्ञानान्धकार का लेश भी नहीं रह जाता।

इसी प्रेम-प्रदीप्त ज्ञान से ये सिद्ध ज्ञान प्राप्त करती हैं। इस प्रकार ज्ञान और प्रेम में सिद्ध होकर ये उनकी वंशी ध्वनि सुनने और उसके स्वरों में अपना स्वर मिलाने की अधिकारिणी बन जाती हैं।

तब वृन्दावन के उस शान्त उपवन में उनकी वंशी बजती है। गोपिकाएँ उसे सुनती हैं, क्योंकि उसे सुनने के योग्य उन्होंने इन्हें पहलेसे बना रखा है और ये उसकी प्रतीक्षा कर रही हैं।

आकाश में जो चन्द्रमा है, वह इन गोपियों के समग्र अस्तित्व को प्रकाशित करनेवाले प्रेमरूपी चन्द्रमा से अधिक प्रकाशमान नहीं है।

वृन्दावन की शोभा इनकी अव्यक्त मधुर आकाङ्क्षाओं की एक फीकी-सी और निर्जीव छायामात्र है।

प्रत्येक गोपी एक जीता-जागता, चैतन दिव्य धाम बन गयी है।

अब समय आ गया है कि भगवान् आकर इनके आत्मा पर अधिकार कर लें, इनका और सब कुछ तो वे पहले ही ले चुके हैं। क्या इन्होंने कभी उन्हें कुछ देने में नाहीं की है जो अब करेंगी?

रोज ही तो वे इनकी सबसे प्रिय वस्तुओं को दूध-दही के रूप में छीन-झपटकर लेते ही रहे हैं। उन्होंने इनकी सारी ऐहिक सम्पत्ति छीन ली है और इनका माखन चुराकर, इनके बर्तन-भाँड़े फोड़कर इनपर अपना प्रभुत्व और भी सुस्पष्ट कर दिया है।

इससे भी सूक्ष्म स्तर में उन्होंने इनके सारे अहङ्कार को वस्त्रहरण के बहाने हर लिया है। अब इनके पास रह ही क्या गया है? केवल इनकी पृथक् सत्ता का भाव, हम अलग हैं, और ये अलग हैं—यह बुद्धि; इसे भी नष्ट करना है।

ये अपने घरों का सब काम-काज करती हैं; उनसे ये बँधी नहीं हैं, किन्तु उन्हें छोड़ भी नहीं सकतीं। इनका संसार उनके और इनके बीच कोई व्यवधान नहीं डालता, बल्कि वह श्रीकृष्ण के गुह्य मन्दिर का प्रवेशद्वार बन जाता है।

और तब वंशी ध्वनि होती है। स्फटिक की बनी हुई निर्मल धार की तेज छुरी की तरह हृदय को चीरने-वाली, सर्वाङ्ग में अलौकिक उन्मादन-माधुर्य भरनेवाली वंशीध्वनि।

इनकी आत्मा सुनती है उस वंशीध्वनि को और दौड़ पड़ती है उसी की सीध में श्रीकृष्ण के समीप!

और तब रास आरम्भ होता है। सब श्रीकृष्णमय, सब श्रीकृष्णमय बन जाता है। वास्तव में सब कुछ श्रीकृष्णरूप हो जाता है। ■

"আমরা ভিতরে যা বাইরে ঠিক তাই দেখি, কেননা জগৎটি আমাদের আয়নার মতো।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

সংযুক্ত ক্ষেত্র সংস্কারশালা বৈঠক, কটক, ওড়িশা

মার্গদর্শক মণ্ডলীর বৈঠক, শিলিগুড়ি, উত্তরবঙ্গ

মার্গদর্শক মণ্ডলীর বৈঠক, ব্যারাকপুর, দক্ষিণবঙ্গ

মার্গদর্শক মণ্ডলীর বৈঠক, মায়াপুর, মধ্যবঙ্গ

VISHVA HINDU VARTA
Phone : 2555-3589

RNI NO. : 30136

15th September, 2026
Price : Rs. 15 only

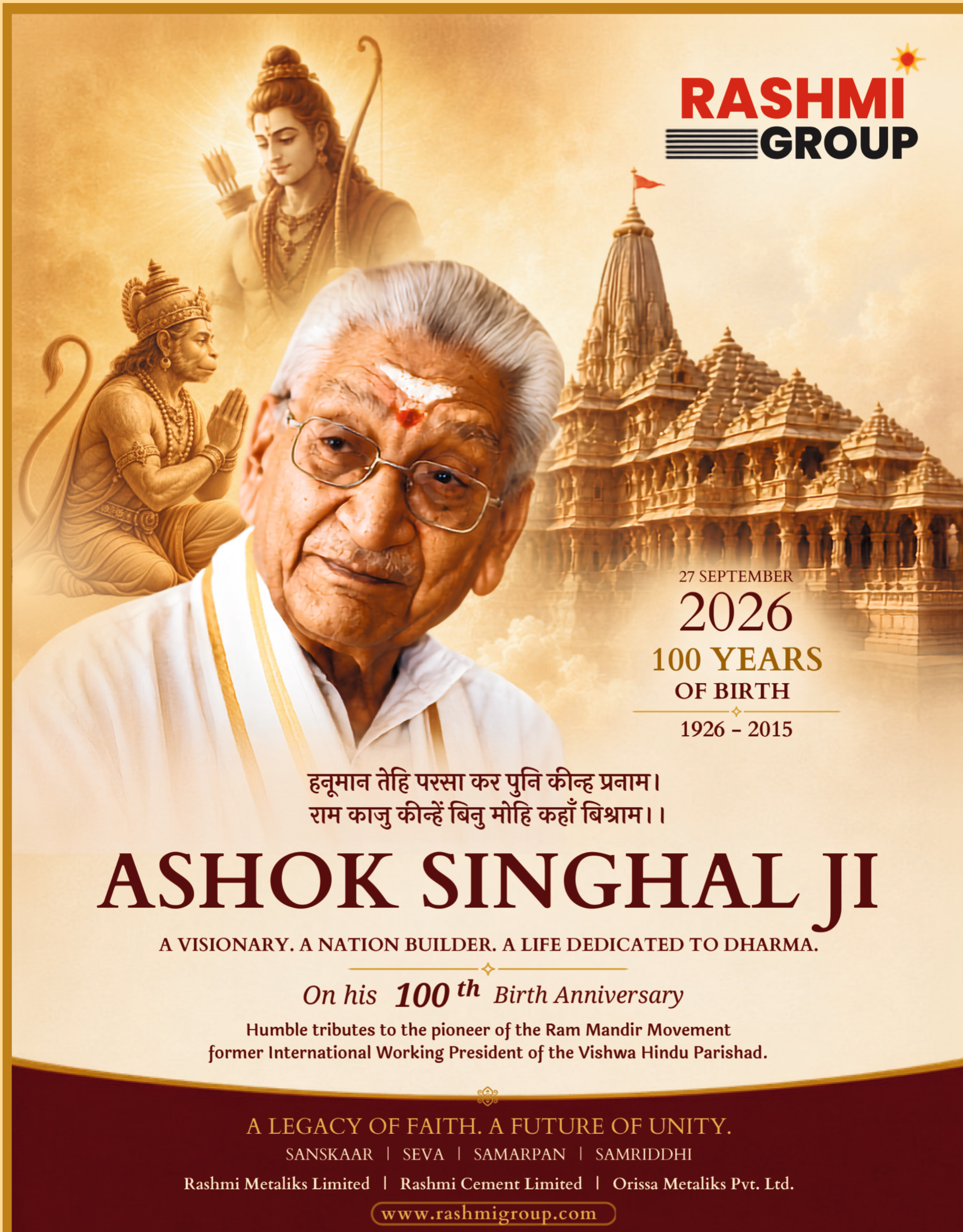

Publisher : VISHVA HINDU PARISHAD, Dakshin Banga ● 33, Bhupen Bose Avenue, P.S.-Shyampukur, Kolkata-700004
Printed at Aditya Graphics & Printing ● B/15/1/H/2, Balai Singha Lane, P.S.-Amherst Street, Kolkata-700009
E-mail : vishvahindu1975@gmail.com